গোলকধাঁধা

১

পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, পরিবার পরিজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যস্থলেই অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। তিনি ছিলেন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, মাঝে মাঝেই বাঁকুড়া হইতে বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান হইতে বীরভূম, এই প্রকার আনাগোনা চলিত। একটা সপরিবার বসতি দুই এক বছর পরে পরে সমূলে উৎপাটন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার হাঙ্গামাও কম নয়। তথাপি ললিতা ও শান্তার তাহাতে আপত্তির পরিবর্ত্তে উৎসাহই ছিল বেশী। কারণ, গতিবিধির দায়িত্ব ও পরিশ্রম যাহা-কিছু তাহা চিরকালই পিতামাতার স্কন্ধে ন্যস্ত, উহার স্ফূর্ত্তি ও ছন্দটুকুই তাহাদের দুই বোনের। কিন্তু এই অস্থায়িত্বের আনন্দের মধ্যে অসুবিধা একটু দেখা দিয়াছিল এই যে, দুই বোনের রীতিমত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল,—আজ এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে এমন করিয়া আর চলেনা। তাহাদের পুরাতন সহপাঠিনীগণ তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া নিয়মিতভাবে শ্রেণী ডিঙাইয়া যায়, এটা কাহারও ভাল লাগিলনা। অবশেষে স্কুলের মায়া কাটাইয়া ললিতা ও শান্তা ঘরে আসিয়া বসিল। সিদ্ধান্ত হইল, বাড়ীতে
করিয়া তাহারা প্রাইভেট পরীক্ষা দিবে বন্ধুবান্ধবদের সাথে এক সংসারই।

গোড়া হইতেই মেয়েদিগকে বোর্ডিংয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া অতি অনায়াসেই সমস্যার সমাধান করা যাইত, কিন্তু ডেপুটিবাবু তাহা করেন নাই। বোর্ডিংয়ে হোষ্টেলে মেয়েদের পাঠাইলে আভিজাত্য খর্ব হইবার সম্ভাবনা, অথবা পুত্রহীন কন্যাবৎসল পিতামাতার স্নেহাতুর প্রাণের আকর্ষণ, কোন্‌টি ইহার সঠিক কারণ জানিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, ফল ইহাতে নিতান্ত মন্দ দাঁড়ায় নাই। প্রাইভেট্ পরীক্ষা দিবার বৃথা আশা পুষিয়া রাখিতে রাখিতে যে একশ্রেণীর মেয়েকে অবশেষে সংসার পরীক্ষার দিকেই ঘেঁসিতে দেখা যায়, ইহাদের ভাগ্যে তেমনটি হয় নাই। তবে ললিতার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে বয়স একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, এই যা। শান্তা ছোট, শান্তার তাহাও হয় নাই। এদিকে লাভের ঘরে দেখা যায় এইটুকু যে, বোর্ডিংবাসিনী বালিকাদের মত ইহারা ততটা অত্যধিক বাকচতুর ও সৌখীন হইয়া উঠিতে পারে নাই। মোটের উপর, পিতার তত্ত্বাবধানে দেশবিদেশে যাযাবর অবস্থার মধ্য দিয়া ইহারা ভালয় মন্দয় গড়িয়া উঠিতেছিল বেশ।

কিন্তু বৎসরাধিক হইল পিতা লোকান্তরিত হইয়াছেন। ললিতা ও শান্তাকে লইয়া মা এখন আছেন দেবর প্রিয়লালের কলিকাতার বাটিতে।

প্রিয়লালই ডেপুটিবাবুর একমাত্র ভাই। সহোদর ভাই বটে, তবে বয়সের তফাৎ অনেক। প্রিয়লালবাবুর বয়স তেত্রিশ কি চৌত্রিশ, কলিকাতাতেই কোন্ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল. নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহার পত্নী সুষমা আর একটি শিশুপুত্র। সুতরাং বাড়ীটি তাঁহার এত প্রকাণ্ড না হইলেও চলিত। এ কয় বৎসর একরকম ফাঁকাফাঁকাই ঠেকিতেছিল, আজকাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবারবর্গ পরিবারভুক্ত হইয়া পড়াতে বেশ মানানসই রকমে পূর্ণ হইয়াছে।

দোতালা বাড়ী। আশে পাশে এতটুকু খোলা প্রাঙ্গণ নাই। কলি-

কাতার বক্ষস্থলে এই রকমটিই স্বাভাবিক মনে করিয়া সুষমা ইহা লইয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। নহিলে তিনি যে প্রকার রুচিজ্ঞান-বিশিষ্ট মহিলা, ইহা কোন মতেই বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারিতেননা। তবে মাঝে মাঝে যে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া পার্ক ষ্ট্রীট্ অথবা বালীগঞ্জে স্থানান্তরিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে নাই, এমন কথাও বলা যায় না। তবে এযাবৎ তাহা কাজে পরিণত হইয়া উঠে নাই। কাজেই আপাততঃ তিনি এই বাড়ীটিরই অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে পুষ্পদামের আমদানী করিয়া ইহার কাব্যবিবর্জ্জিত জীবনে একটু রঙীন হাসি ধরাইতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। ললিতা ও শান্তা প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে পদার্পণ করে, তখন যে একান্তই শ্বাসরোধ হইয়া মারা যায় নাই, তাহা নিতান্ত কাকীমার এই সৌন্দর্য্যবোধটুকুর 'কল্যাণেই।' এজন্য কাকীমার প্রতি তাহাদের অনেকখানি কৃতজ্ঞতা জমা হইয়া আছে। চিরদিন রাজধানীর বাহিরে দূরে দূরে খোলা প্রকৃতির মাঝখানে বেড়াইয়া আজ হঠাৎ এই কলিকাতার ধূম্রাচ্ছন্ন, ধূলিধূসরিত, বদ্ধ প্রাচীরগুলির আবেষ্টনে আসিয়া তাহারা বাঁচিবে কেমন করিয়া? ইহারই মধ্যে শরীর মন হাঁপাইয়া উঠিতেছে যে! চারিদিকে যতদূর চক্ষু যায়—শুধু মাঝে মাঝে দুই চারিটা উঁচু গাছের উচ্চশির, আর সবই একাকার ইটপাটকেলের স্তূপ! কোনটা ছোট, কোনটা বড়। ইহার মধ্যে যে মানুষের প্রতিভা, পরিশ্রম, শিল্প, বিজ্ঞান কেমন আশ্চর্য্যভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে তাহাদের লক্ষ্যই পড়ে নাই; ইহার পাষাণের অন্তরালে প্রকৃতি যে চিরনির্ব্বাসিতা হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের প্রাণে বাজিল শুধু সেইটি। সে ছিল কেমন নিস্তব্ধ, নিরালা, এখানকার গণ্ডগোল কি ভয়ানক! কেমন ছিল আলো-ছায়ার অবিরাম ছেলেখেলা গাছের পাতায় পাতায় মাথায় মাথায়; এখানে কেবলই আলো—বড় বেশী প্রখর, বড় স্পষ্ট! সেখানে সবই যেন কাঁচা,

সবই ঝবি,—এখানে সকল জিনিসই হঠাৎ অত্যধিক প্রবীণ ও কেজো হইয়া উঠিয়াছে!—যাহাই হউক, এতদিনে ললিতা ও শান্তা এগুলির সঙ্গে নিজেদের থাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে মন্দ নয়। যাহা আছে তাহা লইয়াই যখন বিচার, তখন কাকীমার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও এই নিৰ্জ্জীব অট্টালিকাটির দেহে কৃত্রিম উপায়ে জীবন সঞ্চারকেই শ্রেয়ঃ মনে করিল। এবং বাধ্য হইয়া ইহাতেই এখন সন্তুষ্ট।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই যে ঘরটি সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে, সেখানা প্রিয়লালবাবুর পাঠাগার। বসিবার ঘর নীচে; সেখানে বহিঃসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার মত কয়েকখানা ঝক্‌ঝকে চেয়ার ও একটি মস্ত বড় টেবিল ছাড়া লক্ষ্য করিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। তাঁহার আসল নিকেতন হইল উপরের এই ঘরখানা। ঘরটি আয়তনে নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়, কিন্তু বিপুল কলেবর অসংখ্য আলমারী ও শেলফের ভীড়ে দর্শকের চোখে ছোটই ঠেকে। সেখানে ছেঁড়া, মলাটহীন, বহু পুরাতন বইয়ের রাশিও যেমন অফুরন্ত, বিলাতে সদ্য প্রকাশিত মহার্ঘ গ্রন্থেরও অভাব কিছুমাত্র নাই। তাহার মধ্যে আবার বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে চক্ষুস্থির! তিনি কোন্ বিষয় লইয়া যে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় সঠিক লিখিত আছে; নহিলে আলাপে আলোচনায় বাহিরের লোকের তাহা ধরিবার সাধ্য নাই! প্রিয়লালবাবু না জানেন, এমন বোধহয় কোনও বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুস্তকের আলমারীগুলি তাহারই সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে যেমন হিতোপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাদম্বরী, মুদ্রারাক্ষস এবং বেদান্ত ও ঋগ্বেদ পর্য্যন্ত গিয়া উঠিয়াছে, ঠিক বিপরীত দিকের সামনের আলমারীটির দিকে চাহিলে তেমনই দেখা যায়, চারি পয়সার একটি ধারাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া থিওরি অব্ রিলেটিভিটি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। পূর্বদিকের দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া যে দুইটি—

তাহাদের তাকে তাকে যেমন দেখা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, তেমনই ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণার্ডশ'।

বারান্দার ওপাশে যে ড্রয়িং রুমটি (যাহার প্রতি ঐ আখ্যা প্রয়োগ করা প্রিয়লালবাবু আদৌ পছন্দ করেননা, কারণ 'ড্রয়িংরুম্' শব্দটি নাকি আধুনিকতার পরিচায়ক) সেখানে দক্ষিণের খোলা হাওয়ার যাতায়াত কোথাও প্রতিহত হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা ও জ্যোৎস্নারাতে ললিতা ও শান্তার এই ঘরটির প্রতি বেজায় আকর্ষণ।

বিকালে খোলা ছাদটুকুও কম লোভনীয় নয়। বৈকালিক আহার সমাপন করিয়া ললিতা, শান্তা ও কাকীমার উর্দ্ধারোহণ প্রায় নিত্যকর্ম্ম। ছাদের রেলিংয়ের উপরে ও নীচে সারি সারি করিয়া টবে ফুলের গাছ। ফুল বারোমাস ফোটেনা, কিন্তু কাকীমার আগ্রহ ও যত্নের কল্যাণে অন্ততঃ গাছগুলি সজীব ও সবুজই থাকে। গাছগুলির যতকিছু কৃতজ্ঞতা কাকীমারই প্রাপ্য, এবং ললিতা শান্তারও কিছু কিছু।

২

রবিবার।—

কলেজের হাত হইতে নিষ্কৃতি। ললিতা ও শান্তা ঘরে বসিয়া আপন আপন রুচি অনুসারে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে। পাঠ্যপুস্তক কাহারও হাতেই নাই। সুষমা নিজের ঘরে দুরন্ত শিশুটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘুম পাড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, শীতের দুপুর কখন্ দেখিতে দেখিতে ছুট্ করিয়া পালাইবে, ইহারই মধ্যে একটু না ঘুমাইয়া লইলে নয়। ললিতার মাতাও সুপ্তিমগ্ন। প্রিয়লালবাবু বোধহয় নীচে। বাড়ীর মধ্যে আর কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নাই। বাহিরে রাস্তায় অবিশ্রাম মানুষের যাতায়াত এবং যানবাহনাদির ছুটাছুটি চলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও যেন কেমন একটা একটানা শ্রান্তির সুর। কাজ করিতে হইবে সুতরাং করিয়া যায় প্রাণহীন কর্ত্তব্যের মত, প্রথম প্রেরণার পুলকস্পন্দন আর নাই। লক্ষ লক্ষ কম্প্রশীল জীব বুকে লইয়াও কলিকাতার মাঝখানে কেমন্ যেন নির্জ্জনতা। বড় উদাস! দুই জনেরই ভাল লাগিল।

শান্তা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে বই পড়িতেছে —গোর্কির একখানা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ। শান্তার বয়স এখন সতেরো, বেথুন কলেজে আই-এ পড়ে। বই পড়ার দিকে ঝোঁকটা তাহার কিছু বেশী, তবে পড়ার বইয়ের দিকে কতটা, বলা শক্ত। কাকাবাবুর ঘরে যে রাশি রাশি বিচিত্র সব গ্রন্থ শোভা পাইতেছে, সেইদিকে তাহার বড় আকর্ষণ। সকলগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার মত বিদ্যা যে এখনও অর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে নাই, ইহাতে শান্তার মাঝে মাঝে ভারি ক্ষোভ হয়। ইচ্ছা করে, যেন উহাদের বিচিত্র সুরধারা আকণ্ঠ পূরিয়া পান করে। ললিতার বয়স প্রায় কুড়ি কি

আরও বেশী। সে পড়ে বি-এ। দুইজনের বয়সের তফাৎ যত, মনের তফাৎ তাহার চেয়ে অনেক কম। শিশুকাল হইতে প্রতিমুহূর্তে একই সঙ্গে দুইজনের খেলা ধূলা, একই সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস, একই চিন্তা ও প্রেরণার মধ্যে দুইটি মনের উন্মেষ, ইহাও তাহাদের পরস্পরের নিবিড় বন্ধনের কতকটা কারণ, আবার উভয়েরই প্রকৃতির মধ্যে যে একটু সহজ সরস স্নেহের বীজ আত্মগোপন করিয়া আছে, যাহা আত্মীয়-পর, চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সব কিছুকেই আপনার করিয়া লইতে চায়, তাহাও কতক।

পড়িতে পড়িতে শান্তা তন্ময় হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ বাহিরে রাজপথে শোনা গেল উচ্চকণ্ঠে কাহার গান। ঝুলির মধ্যে ছেলে পুরিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া যে বেদেরমণী রোজই দুপুরবেলা ফুটপাথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায়, গানটি তাহারই। বাড়ীর নিস্তব্ধতা এবং বাহিরের সুরহীন কলরব ভেদ করিয়া অকস্মাৎ যে ঝঙ্কার উঠিল, তাহা মর্মে গিয়া বাজিল ঠিক যেন নিঃসঙ্গ নিশীথের স্বপ্নরাগিণীর মত। ললিতা বলিয়া উঠিল, "বাঃ!" শান্তা বইয়ের পাতা মুদ্রিত করিয়া কোলের উপর ফেলিয়া দিল। কী সুন্দর! কী আশ্চর্য! এমন সুস্পষ্ট অথচ সুললিত কণ্ঠ, এমন সজীব আনন্দের স্পন্দন। সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন প্রাণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। শান্তা উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল।

ছেঁড়া ময়লা একখানি বস্ত্রে অর্দ্ধ আবৃত হইয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে। পিঠের উপর বাঁধা একটি ছেলে, আর একটি মাটিতে মায়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া। গানের সুরে যত কিছু প্রেরণা, তাহার মুখের ভাবে বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। নিতান্ত ভিক্ষুকের আর্ত্তি ও আকিঞ্চনভরা চোখ।

ললিতা স্নেহপরবশ হইয়া জানালা দিয়া হাত গলাইয়া একটি পুরাতন গরমজামা ফুটপাথের উপর ফেলিয়া দিল।

খানিকক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শান্তা ফিরিয়া আসিয়া বইখানি আবার তুলিয়া লইল। গান বাহিরে আরও কতক্ষণ ধরিয়া শোনা গেল। কখন্ যে পরে ধীরে ধীরে দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা মনোযোগ করে নাই। কিন্তু বই আর ভাল করিয়া পড়া হইতেছে না। একবার মাঝখান হইতে তুলিয়া আনিয়া মনটাকে আর কিছুতেই সে ঠিক জায়গাটিতে যেন ঠিকভাবে বসাইতে পারিতেছে না। সুরের বেশ মাথার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে। বাশিয়া ছাড়িয়া কলিকাতার এক ভিখারিণীর পিছনে পিছনে এবং ভিখারিণীকেও ছাড়িয়া অবশেষে বিপুল বিশ্বের বিরাট বেদনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। বই হইতে হাত এলাইয়া দিয়া শান্তা অর্থহীন চোখে সামনের দেয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুইজনের মনের ভাব দুইটি একই সুরে বাঁধা। একই পীড়নে ঠিক এক জায়গায় ললিতারও মনে বেশ বাজিতেছে। সে বলিল, "ভাখ্ শান্তা, কতদিন থেকে তো ভিখিরীকে ভিক্ষে দেওয়াই কেবল চলছে, তবু তো কই দুঃখও ঘোচে না, ভিক্ষেও ঘোচে না—যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।"

শান্তা অন্যমনে ধীরে ধীরে বলিল, "দুঃখ হয় তো ঘোচ্‌বার নয়, দিদি।"

"নয়? একথা আমি মান্‌তে পারিনে, ভাই। হয়ত এতদিন যে উপায়ে প্রতীকারের চেষ্টা চলেছে, সেটা গোড়াতেই ভুল—"

শান্তা উত্তর করিল না।—ভুল? তাহাই হইবে, অন্ততঃ যদি হয় তবেই মঙ্গল! নহিলে এই লক্ষ কোটি মানুষের বেদনার অবসান কি কোনদিন হইবে না? এতখানি ভার বুকে লইয়া বসুন্ধরা বাঁচে কেমন করিয়া?

ললিতা বলিল, "এই ভুল আমাদের আবিষ্কার কর্ত্তে হবে। এবং সত্যি পথটিও খুঁজে বার কর্ত্তে হবে সেই সঙ্গে।"

শান্তা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কিন্তু আমরা কি পারব, দিদি? সম্ভব হবে?"

"ছাখ্ ভাই, সম্ভব অসম্ভব জিনিসটা অনেক সময়েই নিজের মনের জোরের ওপর নির্ভর করে। কার মধ্যে কতটুকু শক্তি যে রয়েছে, আগে থেকে তা জানবি কি করে? বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তবে তো!"

কথাটা সত্য; ভাবিতেও ভালো লাগে। মনের মধ্যে শান্তা কতবার নিজেও এমন সব কথা ভাবিয়াছে। কতদিন নিজের মধ্যে কেমন যেন শক্তির প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু সে আত্মপ্রত্যয় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। দিদি ছাড়া কেহ তাহাকে কখনও এদিকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার যত্নও করে না। করিলে বেশ হইত।—ললিতার কথায় আবার শান্তার চোখের সামনে স্বপ্ন ভাসিয়া উঠিল। কত দেশ, কত সৌন্দর্য্য, কত নরনারী, উপভোগ করিবার মত কত প্রাণ! কিন্তু তবু আনন্দের এত অভাব, এত বেদনা কেন? আলাউদ্দীনের প্রদীপের মত এমন একটা কিছু আবিষ্কার করা যায় না কি, যাহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সকলের মনের শূন্যকোষ ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিবে? বিশ্ব ভরিয়া এত আনন্দ সম্ভার যে বৃথাই যায়—যদি সে ভাণ্ডারের চাবীকাঠিটির সন্ধান মানুষকে না দিতে পারি! কিন্তু এত যুগ ধরিয়াও তো কেহ পারিল না! তাহার চেয়ে কত বড় বড় মনীষী, কত মহানুভব চিরকাল খুঁজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত জিনিসটি পাওয়া গেল কই? যখনই যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, মানুষ তাহাকেই পরশমণি মনে করিয়া আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, কিন্তু সবই যে ভুল প্রমাণিত হইল। কোথায় একটা খুঁত রহিয়া গিয়াছে!

দিশাহারাভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া হঠাৎ শান্তা অধীর হইয়া হাল ছাড়িয়া ছাড়িয়া দিল,—"দুত্তোর ছাই! এ হয় না, আমার মস্তিষ্কের কর্ম্ম নয় এ পথ আবিষ্কার করা!"

৩

সন্ধ্যার একটু পরে। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলিতেছে। প্রিয়লালবাবু উপরে তাঁহার পড়িবার ঘরে টেবিলের উপরে খানকতক বই—নামাইয়া পড়াশুনা করিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই তিনি একবার বেড়াইতে বাহির হন। আজ কোনও কারণে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে।

শান্তা একবার ভাবিল, কাকাবাবুর কাছে এইবেলা লজিক্‌খানা লইয়া যাই। প্রায়ই প্রিয়লালবাবুকে বেশীক্ষণ পাওয়া যায় না, নিজের কাজকর্ম লইয়া তিনি বড় ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া, তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে অনেক সময়েই দিনক্ষণ বাছিয়া গুণিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বড় অদ্ভুত ধরণের গম্ভীর তিনি। অথচ সময় সময় তাঁহার মধ্যে যে সরল স্নেহ এবং শিশুর প্রাণ দেখা যায়, তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। লোকে কেন যে তাঁহাকে ভয় করে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না; অথচ ভয় যে করে, তাহাও নিতান্ত পরিস্ফুট। বাহিরের লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে বটে বাড়ীর পরিজনেরাও করে, কিন্তু তাঁহাদের কাছে তিনি একটি হেঁয়ালি। মাঝে মাঝে শান্তাও ভাবে—মানুষটির মধ্যে এ কেমন রহস্য? অথচ রহস্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যে প্রিয়বাবুর জীবনে কোথাও কিছুই নাই, তাহা শান্তা ভাল করিয়াই জানে। তাঁহার চলাফেরা, কার্যকলাপের মধ্যে অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য যাহা-কিছু, তাহার মূল বাহিরের কোনও ঘটনা-বৈচিত্র্যে নাই, আছে প্রকৃতির উপাদানে। তাঁহার সারল্য ও অন্তরের সুগোপন সহজ স্নেহকে শান্তা ভালবাসে, কিন্তু বাহিরের ঐ কঠোর দৃষ্টি—যাহা যেন সকলকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আপনি একা শির উঁচু করিয়া

দাঁড়াইতে চায়—সেটি শান্তার একেবারেই ভাল লাগে না। বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত সেও কাকাবাবুকে ভয় করে।

ভয় করিলেও এতদিন একত্র থাকিয়া থাকিয়া বাধ্য হইয়া অনেকটা সহিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে প্রিয়লালবাবুর সঙ্গে গল্পও হয়ত দুই চারিটা করে। মুহূর্ত্ত কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শান্তা লজিক খানা হাতে লইয়া আসিল। ঘরে ঢুকিতেই প্রিয়লাল মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতা।

শান্তা বলিল, "একটু বুঝিয়ে দেবেন কাকাবাবু?"

টেবিলের উপর হাত বাড়াইয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "কই, কি বই দেখি?"

বইখানা ছিল ডিডাকটিভ লজিক। শান্তা লজিক পড়িতেই বড় ভালোবাসে, বিশেষ করিয়া যেখানে দর্শনশাস্ত্রের একটু ছিটেফোঁটা গন্ধ পাওয়া যায়। অবতরণিকাতে রিয়ালিজম, কনসেপ্‌চুয়ালিজম্‌ প্রভৃতি লইয়া বহু সব গবেষণা আছে, সেইখানেই শান্তার আকর্ষণ, পটকাও বাধিয়াছে তাহারই কোনও একটি অংশে।

প্রিয়লালবাবু নিজে বিদ্বান্‌ এবং বিদ্যোৎসাহী। পড়াশুনা বুঝাইতে তাঁহার উৎসাহ ব্যতীত বিমুখতা কখনও দেখা যায় না। সামান্য বিষয় লইয়াই অনর্গল যত রাজ্যের যত কথার অবতারণা করিয়া শ্রোতার বিস্ময় ও বিমূঢ়তা উৎপাদন করিতে তিনি নিপুণ। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার হিসাবে কথাগুলি প্রয়োজনীয় হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার ব্যস্ততা নাই। তিনি চাহেন জ্ঞান—নিখুঁত জ্ঞান। সুতরাং শান্তার রিয়ালিজম্‌ নমিনালিজমের সূত্র ধরিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আলমারী খুলিয়া আনিলেন—জেভন্‌স্‌, মিল।

শান্তার ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি নাই, যেমন বক্তা, তেমন শ্রোতা।

বক্তৃতার স্রোত যখন চলিয়াছে পূর্ণবেগে, হঠাৎ সুষমা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আসিয়া দেখা দিলেন,—"ওগো, একটু থাম্‌বে ?"

অসময়ে বাজে লোক আসিয়া চাকুরীর রিকমেন্‌ডেশন্‌পত্র, পিতৃদায় কন্যাদায়ের সাহায্য, অমুক সমিতির চাঁদা ইত্যাদির জন্য যখন উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে, তখন দুই এক কথায় তাহাদের বিদায় দিবার জন্য সে সুগম্ভীর, সংক্ষিপ্ত জবাবের সুর প্রিয়লালবাবুর অত্যন্ত অভ্যস্ত, ঠিক সেই সুরে তিনি উত্তর করিলেন, "কি, বল !"

সুষমা ইহাতে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না। ইহা তাঁহার নিকট চিরপরিচিত। তিনি ভূমিকা না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমাদের একবার এক্‌জিবিশানে নিয়ে চল না !"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, "সে কি !"

"সে বিশেষ কিছুই নয় ! কদ্দিন থেকে তোমাকে তো বলে বলে আর পারা গেল না—কেবলই ওজর দেখানো হচ্ছে 'সময় নেই,' 'সময় নেই' ! খোকা এখন ঘুমিয়েছে ; এইবেলা আমাদের নিয়ে চল দেখি !"

প্রিয়লালবাবু বুঝিলেন, হাত ছাড়ানো সহজ হইবে না। বইসুদ্ধ হাতখানা কোলের উপর নামাইয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি যদি আগেই বেরিয়ে যেতুম ?"

"যদি যেতে—সে তো সাবজানক্‌টিভ মুডের কথা হল ! যাওনি তো ? এবারে চল।"

"এই রাত দুপুরে !!"

সুষমা কোনও মতেই হার স্বীকার করিবেন না।—"রাত দুপুর কোথায় দেখ্‌লে, মাত্র সাতটা। চল চল, আর দেরী কোরো না সত্যি !" শান্তাকে একটা সস্নেহ ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বইগুলো সব তুলে রাখ্‌ দেখি !"

নেহাৎ যেন অনিচ্ছুক ভাবে চেয়ারের উপর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "একেবারে নাছোড়বান্দা। আচ্ছা, কে কে যাবে শুনি?"

"যাবে সবাই—আমি, ললিতা, শান্তা। শুধু দিদি থাকবেন বাড়ীতে।"

অগত্যা সম্মতি দিতেই হইল। শান্তার আপত্তি বা উৎসাহ কিছুই বিশেষ ছিল না। সপ্তাহ তিনেক পরে একটা পরীক্ষা, এই যা আপত্তির কারণ। তাড়াতাড়ি বই গুছাইয়া উঠিয়া পড়িয়া সে কাকীমার সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেশবিন্যাস করিতে সচরাচর সুষমার একটু দেরীই হইয়া থাকে, আজ ততটা সময়ক্ষেপ করিবার সুযোগ হইল না। কোনও রকমে হাতে একটা খোঁপা জড়াইয়া কাঁটা গুঁজিয়া দেরাজ হইতে টানিয়া একখানা শাড়ী বাহির করিলেন। তাড়াতাড়িতেও শাড়ীখানার মধ্যে এতটুকু রুচিবৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারিল না—চওড়া জরির পাড়ওয়ালা একখানা শাদা মান্দ্রাজী শাড়ী, আঁচলের কাছেও অনেকখানি সোণার আভা জল্ জল্ করিতেছে।

শান্তার সে সব বালাই বড় নাই। বেশ পরিবর্তন করিয়া কি শাড়ী যে ললিতা তাহাকে পরাইয়া দিল, তাহাও বোধ হয় খেয়াল হয় নাই—তর্কশাস্ত্রের জটিল জটাভার তখনও মাথায় চাপিয়া আছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। উদ্যোগটি হইয়াছে হিন্দুসভার তরফ হইতে। শুদ্ধি ও সংগঠনের ঢেউ জাতির বুকে এই নূতন স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। শতশত বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধমৃত অথবা লুপ্তচৈতন্য হিন্দুজাতি আবার যে কিছুকাল যাবৎ নিজের মধ্যে প্রাণের সাড়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য, অথবা এই একটুখানি সাড়াকে সমগ্রজাতির বুকে সুদূরপ্রসারী করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতযুগে কি শিল্প,

কি বাণিজ্য তাহার ছিল, বর্ত্তমানে লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ নূতন শিল্পের উদ্ভব হইযাছে এবং হইতেছে, ইহার যথাসম্ভব যেখানে যাহা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই বর্জ্জন করেন নাই। প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার তুলনা আপামর জনসাধারণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ এবং বায়োস্কোপ আমদানী করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। আয়োজন যেমন হইযাছে, তাহাতে নূতন উদ্যমের পক্ষে প্রচেষ্টাকে বিফল বলা যায় না।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সপরিজন প্রিয়লালবাবু টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। স্কোয়ারটির ভিতরকার অবস্থা যেন আপাদমস্তক বদলাইয়া গিয়াছে। দেখিলে চেনা যায় না। প্রান্তরটির ঠিক কেন্দ্রে গোলাকার একটি কুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার পায়ের তলা হইতে সোজাসুজি চলিয়া গিযাছে চারি প্রান্ত পর্য্যন্ত চারিটি লাল প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তাগুলির কাটাকাটির মধ্যে পড়িযা যে চারিটি ত্রিকোণাকার সবুজ ভূমিখণ্ড পাওযা গিয়াছে, তাহার শ্যামলতাটুকু শুভ্র আস্তরণে এবং তদুপরি দর্শকমণ্ডলীর ধূসর পদরজপাতে একেবারেই ঢাকিয়া গিযাছে। আকাশ হইতে যে অবারিত চাঁদের আলো ক্ষরিয়া পড়িতেছিল, তাহা হঠাৎ স্থানে স্থানে বাধা পাইয়া গিয়াছে অসংখ্য তাঁবুর মাথায় মাথায়। কিন্তু তাহাতে আফশোষ করিবার কিছু নাই; কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তার পাশে পাশে একটু দূরে দূরেই সুশোভন শ্যামল গাছের সারি বসাইয়া দিযা তাহার ফাঁকে ফাঁকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন নানা রঙের বিদ্যুতের নিশ্চল দ্যুতি।

ললিতার ভারি ভাল লাগিল। কাকামীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "দ্যাখো ভাই কাকীমা—ওই যে ঠিক তোমার সাম্নে—ঐ লাল আলোটার ওপাশে কতগুলো শাড়ী টাঙানো রয়েছে কি সুন্দর! চল, একবার দেখি গে' যাই।"

যাইতে যাইতে পথেই চোখে পড়িয়া গেল মিনার কারুকার্য্য-করা অলঙ্কারের দোকান। সুষমা ঝুঁকিয়া পড়িলেন সেই দিকে। লম্বা একটি টেবিলের উপরে একটু বাঁকাভাবে সাজানো লম্বা লম্বা কাচের বাক্সের মধ্যে কত ব্রোচ্, জামার বোতাম, কাণের দুল!

রাস্তার ঠিক বিপরীত পাশেই অর্দ্ধগোলাকার একটুখানি স্থান জুড়িয়া মৃৎশিল্পী তাহার নিপুণতার নিদর্শন খাড়া করিয়াছে। সেখানে আবির্ভূত হইয়াছেন মাটির দেহে প্রাচীন এবং নব-ভারতের যত মনীষিবৃন্দ। কোথাও বাণীবন্দনারত মূর্খ বিপ্র কালিদাস; কোথাও বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন; কোথাও-বেদনাহত নববৈরাগী সিদ্ধার্থ ছন্দকের হস্তে রাজবেশ অর্পণ করিতেছেন; কোথাও মিথিলা প্রত্যাগত রঘুনাথের প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি: কোথাও দীপঙ্কর। শান্তা নিবিষ্ট ছিল এই দিকে। প্রিয়লালবাবুও পাশেই দাঁড়াইয়া। মূর্ত্তিগুলি নিরাপদ্ রাখিবার জন্য রাস্তার পাশেই একটি বেড়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দর্শকদিগের অত্যধিক আগ্রহের প্রকোপে সেটির অবস্থা শোচনীয়।

শান্তা রাস্তার এদিক্ হইতে ডাকিয়া বলিল, "কাকীমা, দেখবে এসো!" সকলে মিলিয়া উৎসাহ সহকারে এদিক্ সেদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া চলিল। এ দোকান সে দোকান হইতে ছোটখাট সৌখীন জিনিস কিনিয়া লইতেও সুষমা কসুর করিলেন না। প্রয়োজন কিছুই ছিল না, পয়সা কড়িও বিশেষ কিছুই সঙ্গে নাই,—তবু সখ!

সাম্নে দেখা গেল কতটুকু খোলা জমি। সেখানেও লোক জমিয়া গিয়াছে বিস্তর। ব্যাপারটি হইতেছে বায়োস্কোপ এবং তাহার ভূমিকাস্বরূপ ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ। বায়োস্কোপ তখনও সুরু হয় নাই।

সুষমা প্রিয়লালকে বলিলেন, "হ্যাগো, বসবার একটু জায়গা খুঁজে দাও দিকি!"

প্রিয়লালবাবু বিনা আপত্তিতেই বাজি। লইয়া যখন আসিয়াছেন, তখন সর্ব্ববিধ আবদারই মঞ্জুর করিতে হইবে। বসিবার স্থানের জন্য একটু খোঁজাখুঁজি করিলেন। চেয়ার বেঞ্চের কোনও উপদ্রব এখানে নাই, সকলেই নির্ব্বিবাদে ঘাসের উপর বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অগত্যা ললিতারাও তেমনই একটুখানি জায়গা খুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

ছবির পর ছবি পড়িয়া যায়, বক্তা ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। প্রথমেই ছবি আসিল সেই পুরাতন জন্মমৃত্যু লোকশিক্ষার হার, বুঝানো হইল জগতের সভ্যজাতির তুলনায় ভারতের দুরবস্থা। শান্তার কোনও উৎসাহ হইল না। বড় একঘেয়ে। এবার আসিল অশীতিপর বৃদ্ধের সপ্তমবর্ষীয়া বধূ এবং তাহার পরিণাম। আসিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর। এও অতি পুরাতন, ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া দেখিয়া চক্ষুর ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়াছে।

ললিতার কিন্তু মন্দ লাগিতেছে না। দেশের দুরবস্থা এবং তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ ও কারণ জানিতে তাহার খুব উৎসাহ। কি করিয়া ইহার প্রতীকার করা যাইবে, কিরূপে দেশের বুকে একটা আমূল সংস্কারের প্রচলন করা সম্ভব, ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনাও সে করে।

আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে স্নেহলতার কচিমুখ ভাসিয়া উঠিল। ললিতা দরদভরা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ইঃ। দেখ্‌ছিস্‌ শান্তা ?—সত্যি কি শোচনীয়।"

সমবেদনায় শান্তাও উত্তর করিল, "সত্যি।"

পট একটির পর একটি যায় আর আসে। বর্ত্তমানের ছবি মুছিয়া গিয়া এবার জাগিল প্রাচীন ভারত। বিশাল অশ্বত্থ-তরুমূলে গুরু সমাসীন,

দক্ষিণে ও বামে বিদ্যার্থী বালকবালিকা, তরুণতরুণী। দূরে দেখা যায় শ্যামল তৃণপ্রান্তরে দুইচারিটি গাভী।—শান্তার মনে নাড়া দিয়া উঠিল। ঐ অধ্যয়নরত নিবিষ্টচিত্ত রুচিমুখগুলিতে কি নির্ম্মল জ্যোতি! ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী ঐ তরুণজীবনগুলির কি অনাবিল শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

ছবি সরিয়া গেল। আসিল রাজর্ষির রাজসভাগৃহ। অগণিত মনীষী, মুনি ঋষিতে গৃহ পরিপূর্ণ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া অনবগুণ্ঠিতা, অকুণ্ঠিতা বিদুষী গার্গী।—বাঃ!—এইবার শান্তার বুকখানা আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। ঐ যে নারীর তর্জ্জনী ইঙ্গিতে সুধীসংসদ্ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্যের অপূর্ব্ব মনীষা যাঁহার মুখামুখি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে তো সত্য!—সে কি শুধু পুরাতন সত্য? প্রাচীন প্রাচীর ব্রহ্মবাদিনীর সত্তা কি অতীতেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—আজ তাহার পুনরভ্যুদয় কি আর সম্ভব নয়? আত্মোপলব্ধিতে মহীয়সী, জ্ঞানের আলোতে সমুজ্জ্বল, গরিমময়ী যে নারী সেদিন ভারতবর্ষে ছিল, আজ তাহা কোথায় গেল?—দেখিতে দেখিতে ছবি মুছিয়া গেল। শান্তার দেহে মনে বহিল একটা শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও আবেগের রোমাঞ্চ!

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ শেষ হইয়া গেল আসিল বায়োস্কোপ। সুষমারা উঠিবার নাম করেন না। খানিক পরে প্রিয়লাল রসভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "কি গো, বাড়ী টাড়ী আর ফিরবার দরকার নেই?"

"বাড়ী তো চিরদিনই রয়েচে!"

প্রিয়লালবাবু বলিলেন, "কল্‌কাতার সহরে সিনেমারও তো অভাব দেখচি না!"

"তা হোক্—তবু—"

প্রিয়বাবু চুপ করিলেন। খানিক পরে সুষমা বলিলেন, "এই—এই ফিল্‌ম্‌টা হয়ে গেলেই উঠ্‌চি!"

৪

দিনগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। একঘেয়ে ভাবে কাটিয়া যাইতেছে। সেই সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া খাবার খাইয়া পড়িতে বসা। সাড়ে নয়টা না বাজিতেই কলেজের গাড়ীর ডাকাডাকি। বিকাল বেলা প্রত্যাবর্ত্তন, সন্ধ্যায় গল্পগুজব, আবার রাত্রিতে পাঠাভ্যাস। কলেজের, সময়টুকু লাগে বেশ! অসংখ্য তরুণীর সমাবেশ—বিবিধ বিচিত্র প্রসঙ্গ, চারিদিকে হাস্যোচ্ছল কলকণ্ঠ! বাড়ীতে সে মুখরতা, সে চঞ্চল ক্রীড়া কোথাও নাই। অবশ্য তাই বলিয়া ললিতা ও শান্তার অসন্তোষ কিছু ঘটিতেছে, তাহা নয়। কারণ, বিচিত্রতার প্রতি উন্মুখ আকর্ষণ যে তরুণ প্রাণের ধর্ম্ম—তুচ্ছ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের মধ্যেও আপনারই অন্তরের অফুরন্ত বিচিত্রতার ছায়া ফেলিতেও সেই জানে।

কিন্তু একদিন বৈচিত্র্য একটু দেখা দিল।

ললিতা ও শান্তা কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। অন্যান্য দিন এ সময়ে সুষমাকে পুত্রের বেশভূষা সমাধা করিয়া আপনার প্রসাধনে ব্যাপৃত দেখা যায়। আজ বাড়ীর চত্বরে পা বাড়াইয়াই শান্তা সবিস্ময়ে দেখিল, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। নীচের তলায় রান্নাঘরে মা ও কাকীমা আহার্য্যের আয়োজনে অত্যন্ত ব্যস্ত। শান্তা উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "একি মা! আজ ব্যাপার কি?"

মা বলিলেন, "লোকজন আস্‌বার কথা আছে কয়েকটি, তাই।"

"কারা মা?"

কাকীমা একটুখানি ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এলেই দেখতে পাবি। যা যা, ওপরে গিয়ে কাপড় চোপড় বদ্‌লে নে গে' যা'।"

ললিতা ইতঃপূর্ব্বেই উপরে চলিয়া গিয়াছে। বিষয়টির তদন্ত করিবার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। শান্তা উপরে উঠিয়া দেখিল, সেখানেও ব্যস্ততার চিহ্ন। ঘর দুয়ারগুলি সাধারণতই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ; কিন্তু ঝি ও চাকরে মিলিয়া তাহার উপরেও পারিপাট্য বিধান করিতে নিযুক্ত। বসিবার ঘরে টেবিলটির উপরে আজ একটি নূতন আস্তরণ পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাব উপর একটি সুরুচিসম্মত ফুলের তোড়া। লোকজন যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা যে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিই হইবেন, সে বিষয়ে শান্তার সন্দেহ রহিল না।

শান্তা কাপড় ছাড়িতে ঘরে ঢুকিল। কৌতূহল নিবারণ করিবার লোভে দুই একবার ললিতার কাছে জিজ্ঞাসা করি-করি করিয়াও থামিয়া গেল। মনের মধ্যে কি যেন একটু সংশয় ঢুকিয়াছে।

সুষমা কি কারণে একবার উপরে আসিলেন। শান্তা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল না কাকীমা—কারা আস্‌বেন ?"

সুষমা হাসিয়া ললিতার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তুই দিনরাত চোখ কাণ বন্ধ করে থাকিস্ নাকি, বল্ দেখি শান্তা ?"

একবার ললিতার ঈষৎ ব্রীড়ারুণ মুখের দিকে এবং একবার কাকীমার সহাস্য ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "বুঝেচি।"

অনেকদিন মা ও কাকীমা যে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহাতে শান্তা এইরকমের একটু আধটু আভাস পাইয়া আসিয়াছে বটে, তবে তাহা যে সত্য সত্যই এতদূর পাকা বন্দোবস্তে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবারও তাহার কখনও অবকাশ ঘটে নাই এবং দিদির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্য থাকা

সত্ত্বেও এ জাতীয় হাস্যকৌতুক করিতে পারে না সে কোনওদিনই। তাহার কেমন যেন বাধে। বাড়ীর গুরুজনেরাও মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধ প্রভৃতি লইয়া তাহাদের সামনে বড় একটা উচ্চবাচ্য করিতে ইচ্ছুক নহেন। ছেলেবেলা হইতে এইসব চিন্তা মেয়েদের মাথার মধ্যে প্রবেশ করানো তাঁহারা অত্যন্ত গ্রাম্যতার পরিচায়ক মনে করেন বলিয়া একদিকে যেমন শান্তাদের পরিবারে ঘটকের উপদ্রব এবং সময়ে অসময়ে মেয়ে-দেখানোর অস্বস্তি অত্যন্ত কম, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্যপ্রথায় পতিপত্নী-নির্ব্বাচন কামনায় নির্ব্বিরোধে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত মেলামেশা প্রিয়লাল বাবু আদৌ পছন্দ করেন না বলিয়া সে জাতীয় রসলীলাও শান্তা দেখে নাই। তাহাদের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশায় কোনও বাধা নাই, কিন্তু বিবাহ ব্যাপারটি প্রায় অভিভাবকদেরই হস্তগত, তাঁহাদের মনোনীত পাত্র মেয়ের পছন্দ হইল কি না, ইহা একটিবার অনুসন্ধান করিয়া লন, এই মাত্র। কাজেই বিবাহটা যখন শান্তার নয়, তখন সে এ বিষয়ে বেশী কিছু জানিতেও পারে নাই।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। ললিতা ও শান্তা কলেজের গল্প, পড়ার কথা, খবরের কাগজের সমালোচনা করিতে সুরু করিয়াছে।

হঠাৎ মাঝে মাঝে শান্তা থামিয়া যাইতে লাগিল।

ললিতা একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল রে ?"

কিছুই হয় নাই।—হাসিয়া শান্তা বলিল, "কথা হারিয়ে যাচ্ছে।" তাহার যেন কেবলই মনে হইতেছিল, ললিতার একাগ্র মনোযোগ এই অবান্তর বিষয়গুলির মধ্যে আজ নিশ্চয়ই নাই, শুধু শোভনতার খাতিরেই সে মনোনিবেশ দেখাইতেছে। আজ দুই বোনের হৃদয়ের তন্ত্রী বুঝি একসুরে মিলিতেছে না—তবে সে আর কি কথা বলিবে? ললিতার

চোখের সাম্নে আজ যাহা হয়ত নূতন স্বপ্নের রূপ লইয়া জাগিতেছে, তাহার মনটাকে যে তাহাই অতি বিশ্রীভাবে খোঁচা দেয়। কেন? কেন জানি না! তবু তো দেয়! তাইত সে বাক্যহারা। দিদির মনের আকর্ষণ আজ এই মুহূর্ত্তে যেদিকে, সে সম্বন্ধে মনোরম করিয়া প্রসঙ্গ তোলা তো শান্তার দুঃসাধ্য। হয়ত বা তাহা এত নিভৃত যে বাহিরের আলোতে টানিয়া আনিলে তাহাকে আঘাতই করা হইবে। শান্তা ঠিক বুঝিতে পারিল না, কি কথা বলা সঙ্গত। যে কথাগুলি আজ ললিতার পক্ষে উৎসাহদায়ক নয়, তাহা অযথা বলিয়া লাভ কি?

অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া সুষমা ছাদে উঠিয়া ডাকিলেন, "এখন থেকেই অত কবিত্ব কি গো? নীচে আয় ললিতা। কাপড় চোপড়টা ছাড়তে হবে না?—আয় শান্তা!"

দুইজনে ফিরিবার উপক্রম করিল। কাকীমা আবার বলিলেন, "ওমা! চুলটাও বাঁধবার অভিরুচি নেই?"—হাসিয়া বলিলেন, "কেয়াবফুল্ কেয়ারলেস্ বিউটি?"

বাস্তবিক, শিথিল চুলের দুয়েকগাছা কপালের এদিক ওদিক্ ছড়াইয়া পড়াতে ললিতার মুখখানা একটু বেশীই সুন্দর দেখাইতেছিল। সে কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিল, "আঃ, কি যে বল কাকীমা!"



ললিতার বিবাহের তারিখ ঠিক হইয়া গিয়াছে। আজ বিবাহ। বাড়ীতে হুলুস্থুল।

একরাশ ফুল ও বিচিত্র পাতা লইয়া শান্তা মালা গাঁথিতেছিল। মণ্টুদা বলিয়াছিল, মার্কেট হইতে আপন অভিরুচি অনুসারে দুইটি মালা কিনিয়া আনিবে; তাহাতে সৌষ্ঠবও হইবে যেমন, সময় সংক্ষেপও হইবে তেমনি। কিন্তু শান্তা তাহা দেয় নাই। দিদির বিবাহের মালা আজ সে নিজের হাতে গাঁথিবে।

গাঁথিতে গাঁথিতে মৃদু নিঃশ্বাস পড়িল। দিদির বিবাহ! এমনটা তো সে ভাবে নাই! দিদি তো তাহাকে বলে নাই কখনও! তা—হউক না! তাহাতে তাহার ভাল লাগে না কেন? আশ্চর্য্য! সকলে উৎসবে মত্ত, তাহার মনের মধ্যে সারাদিন ধরিয়া এমন সঙ্কোচ, বেদনা, বিরাগ কোথা হইতে আসে?

অনেকক্ষণ পরে শেষ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মালা দুইটি একখানি 'ট্রে'র উপরে রাখিয়া দিল।

বিবাহের লগ্ন আটটায়। বেশী দেরীও নাই। কাকীমা সযত্নে ললিতাকে সাজাইয়া দিতে ব্যস্ত। সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ডাক আসিল। সুষমা ও পুরমহিলারা ললিতাকে লইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাঢ় লাল রঙের একখানা রেশমী শাড়ীতে ললিতার সুগোল সুগৌর দেহখানি দেখাইতেছিল বড়ই সুন্দর। ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা ভ্রূ দুইটির উপর দিয়া আকর্ণ চলিয়া গিয়াছে, কালো চুলের স্তবকে কাণের

প্রায় সবটাই ঢাকিয়া আছে, শুধু নীচে জল্ জল্ করিতেছে দুইটি মুক্তার দুল।

সুষমা শান্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আয় রে। সঙ্গে করে নিয়ে যা, দেখিস্ যেন হুটোপুটি করে দৌড়োস্ নে। আস্তে আস্তে চল্‌বি। বুঝলি ?"

শান্তারা কয়েকটি কন্যা মিলিয়া ললিতার সহযাত্রীরূপে অগ্রসর হইল। ছাদের উপরে একখানা শুভ্র চন্দ্রাতপ ছায়া ফেলিয়াছে। বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতের দল ছাদের অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া সমাসীন, বাকী জায়গায় বর, কন্যা, পুরোহিত প্রভৃতির আসন। সপরিষদ্ ললিতা ধীরে সভায় আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তা দেখিল, রক্তাম্বরে বর শোভা পাইতেছেন, পাশে আর একখানি শূন্য আসন ললিতার।

ললিতাকে আসনের উপর দাঁড় করানো হইল। দোতালার ঘরগুলি হইতে নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি ঝঙ্কার দিল। আনন্দে, আশঙ্কায় ললিতার বুকের মধ্যে দুলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তার মনের মধ্যেও কেমন একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। কী এক গভীর বিস্ময়, এক আনন্দ বেদনার রহস্য তাহার চিন্তার প্রবাহে অকস্মাৎ খেলিতে আরম্ভ করিল। যতদিন সেখানেই এই বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইতে সে দেখিয়াছে, এই একটি ভাব তাহাকে নাড়া না দিয়া পারে নাই। এই যে এক একটি পরিবার হইতে এক একটি কন্যাকে সহসা তুলিয়া লইয়া অজ্ঞাত, অপরিচিত এক আবেষ্টনের মধ্যে চিরদিনের মত বসাইয়া দেওয়া হয়, কি স্বাভাবিক ভাবেই কন্যা তাহা মানিয়া লয়! কেন লয়? দুইটি পৃথক্ জীবনকে বাহির হইতে এক করিয়া গাঁথিয়া দিয়া এই মিলনের উপরে ঋষির মন্ত্র, অগ্নির সাক্ষ্য, বিধাতার নির্দ্দেশ প্রভৃতির সমাবেশ করিয়া কী অপার্থিব গাম্ভীর্য্যেরই ছায়াপাত করা হয়। অথচ বাস্তবিক এ ব্যাপারটি কি? বাহিরের এই

যে উৎসবের কলরোল, ওই যে তরুণীদের কৌতূহল ও হাস্যকৌতুক, ইহার মধ্যে তো অতি সাধারণ, লঘু আনন্দ ছাড়া আর কিছু শান্তা দেখিতে পায় না! মানুষ চিরকাল ধরিয়া ইহাকে এমন ভাবে সহজে প্রত্যেক জীবনে মানিয়া লইয়া আসিতেছে, যে দেখিলে মনে হয়—অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার ইহা লইয়াই এত বেশী গুরুত্বের আরোপ তাহারা করে, যেন এ ব্যাপারটি সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব। শান্তার বয়স আঠারো বৎসর পার হইয়া গিয়াছে; বিবাহ অনুষ্ঠানটি পুঁথিগত ভাবে ভাল করিয়াই সে জানে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার তাৎপর্য্য ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, সাতবার বর-প্রদক্ষিণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি চলিল। শান্তা কখনও চারিদিকে চাহিয়া দেখে, কখনও পাখা লইয়া ললিতার তাপাপনোদন করিতে ব্যাপৃত। মাঝে মাঝে কৌতূহলভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে পুরোহিতদ্বয় দুই পক্ষের অভিভাবকের ও বর-কন্যার হাত লইয়া কত রকমের প্রক্রিয়া চালাইতেছে। কতবার করিয়া জলের ছিটা, কতবার করিয়া ফুলদূর্ব্বা উত্তোলন, কতবার কত মন্ত্রোচ্চারণ!

শুনিল প্রিয়লালবাবু থামিয়া থামিয়া পুরোহিতের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন, "—স্য পৌত্রায়—স্য পুত্রায় শ্রীমতে নির্ম্মলচন্দ্র গুহ দাসায়—স্য পৌত্রীং—স্য পুত্রীং শ্রীমতী ললিতা দাসীং দদামি।

ললিতার বাম হাতখানা প্রিয়বাবু বরের হাতের উপর স্থাপন করিলেন। পুরোহিতের নির্দ্দেশানুসারে বর বলিতেছেন, "—প্রতিগৃহ্লামি।"

শান্তার মনে মনে হাসি পাইল। একটি সজীব সম্পূর্ণ মানুষকে বাহিরের একজন লোক আর একজন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এত স্বচ্ছন্দে দান করিয়া ফেলিল? সে-ও কি রকম নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—গ্রহণ করিলাম! আরও হাসি পাইল এই মনে করিয়া—বরের বাবা কিংবা

কাকা তো বরকে ললিতার হাতে অর্পণ করিলেন না! এ মিলনটা যে একেবারে একতরফা ব্যাপার! লোকে বলিয়া থাকে, বিবাহ না হইলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু শান্তা দেখিল—কন্যার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, তাহার যেটুকু নিজস্ব ছিল, বিবাহের প্রথম মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকুও লোপ পাইল। এই আত্মবিলোপে কি সুখ আছে? আপনার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে আত্মচেতনায় কি এতটুকু বাধে না—আত্মসম্মানে আঘাত কি বাজে না? ইহা মানুষ পারে কেমন করিয়া? দিদি পারিল কেমন করিয়া?

মালা বদলের পালা আসিল। শুভদৃষ্টি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শান্তা কখন্ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। বাহিরে উৎসবের বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে। অতি সুস্পষ্ট, অতি মিষ্ট তাহার সুর। রাজধানীব সকল কলরব ভেদ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নির্ণিমেষনেত্রে শান্তা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ছাদের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া দূরের অসংখ্য আলোর রশ্মি তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। আপনার আশেপাশের উজ্জ্বলতাকে আড়ালে ফেলিয়া তাহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে সেই দিকে। বাঁশরীর তান চাপা দিয়া সে শুনিতে লাগিল বাহিরের কোলাহল। জগৎ তো সেই রকমই চলিয়াছে। নূতনত্ব যাহা কিছু আজ তাহাদেরই পরিবারে। একুশ বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত যে মানুষটি তাহাদেরই মধ্যে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ ইহাকে একেবারে ছাড়িয়া চলিল! নূতনত্বই বটে! কিন্তু তাই বা কতটুকু? ললিতা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আবার তাহাদের এই পরিবারখানি পুরাতন চিরাভ্যস্ত নিয়মেই সময় যাপন করিবে না? আজ এই মুহূর্ত্তে যেমন তাহাদের উৎসবের বিচিত্রতা বুকে লইয়াও এই মহানগরী আপনার নিয়মে চলিয়া যাইতেছে, পরশুদিন ললিতাকে আপনার মাঝখান হইতে

বিদায় দিয়াও তাহাদের সংসারটি ঠিক তেমনই বহিয়া যাইবে। সাংঘাতিক কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

কিন্তু একটুখানি পরিবর্ত্তন ঘটিবেই শান্তার হৃদয়ের মধ্যে। দিদিকে সে কত ভালবাসে!

বাঁশীর সুর বড় করুণ হইয়া তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। সকলে বলিতেছে, আজ মধুমিলন! কিন্তু মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিনিময়ে এই মিলন কি এতই লোভনীয়?

শান্তা আপনার অজ্ঞাতসারে একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিল। দিদির কি বিবাহটা না করিলেই চলিত না?

৬

শান্তা আজকাল বি, এ পড়ে। এখন পড়াশুনায় মনোযোগ আগের চেয়ে অনেক বেশী। তিন চারিমাস পরেই পরীক্ষা, ইহাও একটি কারণ, এবং ইহার চেয়ে বড় কারণ এই যে, এখন সে সম্পূর্ণ একা। মা আছেন, কাকীমা ও কাকাবাবু আছেন, তাহাদের শিশুপুত্র মাণিক আছে, নাই শুধু ললিতা। কিন্তু তাহাতেই যেন শান্তা অনেকখানি নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে ঐক্য বাঁধা আর একটি মন না পাইলে মুখে তাহার বেশী কথা যোগায় না, কাজেই সে আপন মনে চুপ করিয়াই আজকাল থাকে। এই ঐক্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিল ললিতার কাছে ; সেখানে তাহার কথা আর ফুরাইতে চাহিত না। আজ বছরখানেক হইল ললিতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাই বাধ্য হইয়াই এখন গ্রন্থরাজির মধ্যে মনোযোগ ফিরাইয়া লইতে হইয়াছে। মন তো তাহার জড় থাকিয়া পচিয়া মরিতে পারে না—তাহাকে সজীব ও সতেজ রাখিবার জন্য খাদ্য তো চাই। মা ও কাকীমার সঙ্গে তাহার নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ আছে বটে। কিন্তু সে যে শুধু হৃদয়ের যোগ—মস্তিষ্কের কোনও সামঞ্জস্য নাই। শান্তা ভাবে, হৃদয়ের যে সত্যিকার প্রেম, তাহা নীরবেই প্রিয়জনের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া যায়, সেজন্য বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। কথার প্রয়োজন শুধু যুক্তি ও চিন্তার রাজ্যে।

বন্ধু একজন আছে বটে—অতসী। সে শান্তার সতীর্থ। প্রথম কলেজে ঢুকিবার কয়েকমাস পরেই তাহার সঙ্গে শান্তার পরিচয়, তাহার পর হইতে আর এই তিনবৎসরের মেলামেশা।

কি করিয়া অতসীর প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল, তাহা আশ্চর্যের

বিষয়। দুইজনের আচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শান্তা বেশভূষায় অতি মাত্রায় অনাড়ম্বর, অতসী নিত্য নূতন শাড়ী পরিয়া মান্দ্রাজী ভঙ্গিমায় আঁচল উড়াইয়া মোটরে চড়িয়া কলেজে আসে। ক্লাসের অতিরিক্ত ঘণ্টা-গুলিতে শান্তার মত সে ক্লাসের মধ্যে অথবা লাইব্রেরীতে গিয়া চুপ করিয়া পড়াশুনা করে না, প্রায়ই তাহাকে দেখা যায় উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকল দলের মেয়েদের মধ্যে মোড়লী করিতে। ইহা সত্ত্বেও অতসীর সঙ্গে কেমন করিয়া তাহার ভাব জমিয়া গিয়াছে, এবং তাহা শুধু এই দুইটি তরুণীর মধ্যেই নয়, সে বন্ধুত্ব এখন কলেজ হইতে বাড়ীতে এবং দুইজন হইতে দুই পরিবারেই অল্পবিস্তর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অতসীর পিতা কলিকাতায় ব্যারিষ্টার। তাহাদের আচার ব্যবহারে ইউরোপীয় সভ্যতা জাজ্বল্যমান; বেশ ভূষায়ও এতাবৎ তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, ইদানীং দেশের 'স্বদেশী' হাওয়ায় কিছু কিছু স্বদেশী সাজসজ্জা বিদেশীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

সেদিন কলেজের ছুটি হইয়া গেলে শান্তা ও অতসী সিঁড়ির উপরকার খোলা বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল। নীচে দেবদারু ছায়াচ্ছন্ন লাল রাস্তাটিতে বিস্তর মেয়ে, কলেজের বাস্, প্রাইভেট্ মোটরকারের সমারোহ। বিকালবেলাকার রক্তসূর্য্যের আভা সবুজ পাতার ফাঁক দিয়া কেমন করিয়া চঞ্চল খেলা করিতেছে দেখিয়া দেখিয়া শান্তার মনে পড়িতে লাগিল ছেলেবেলাকার কথা! সে যুগ কাটিয়া গেছে, সে মায়াপুরী আর নাই, আছে শুধু স্মৃতিটুকু! তাই বা মন্দ কি? আর আজিকার এই ছাত্রজীবন এও তো সুন্দর!

কিন্তু তাহাও যে ফুরাইয়া আসিল।

অতসী বলিল, "থাক্, ক'টা দিনের জন্মে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচা গেল; অ্যালাউড-লিষ্ট না বেরুনো অবধি আর বইয়ের পাতায় হাত দিচ্ছিনে।"

মনের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলিয়া শান্তা প্রত্যুত্তরে হাসিল।

অতসী বলিল, "তুই তো বুঝি আজ রাতেও গিয়ে বই নিয়ে বসবি, না?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "নাঃ! যদিই বা বসি পড়ার বই নিয়ে কক্ষনো বসব না!"

"সত্যি ভাই, রাজ্যের আর যত বই সবই পড়তে ভালো লাগে, শুধু টেক্সট্‌বুক্‌ নিয়ে বসলেই কান্না পায়।"

শান্তা বলিল, "তব তো ভাই তোমার ফাষ্ট ক্লাস্‌ অনার্স একেবারে অবধারিত।" অতসী মিথ্যা বিনয়ের আতিশয্যে কথাটা সজোরে অস্বীকার করিল।

কিছুক্ষণ চুপ।

অতসী আবার বলিল, "তুমি কিন্তু অনেকদিন আমাদের বাড়ী যাও নি ভাই! এদ্দিন টেষ্ট-ফেষ্টের পড়া বলে একটা ওজর ছিল, এবার নিশ্চয় যেও—কাল পরশুই। কেমন?"

"কে নিয়ে যায় বল্‌? এক কাকাবাবু ছাড়া আমার আর একটি লোকও নেই, জানিস্‌ই তো!—তার চেয়ে তুমিই একদিন আমাদের বাড়ী এসো না কেন ভাই? তোমার দাদা আছেন, ছোড়দা আছেন—তাছাড়া তোমার নিজের গাড়ী রয়েছে, তুমি তো সাথী ছাড়া একলাও যেতে পার!"

অতসী বলিল, "তুই একলা চলতে পারিস্‌ নে বুঝি? ভয় করে?"

শান্তা জানে, ভয় তাহার মোটেই করে না; তবে অভিভাবকগণ সম্মতি দেন না, এই মাত্র। কেন যে দেন না, তাহা সে কোনমতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হয়ত কতকটা তাঁহাদের হিন্দুয়ানি, এবং কতকটা আভিজাত্য। অথবা হয়ত কতকটা অবিশ্বাস। অবিশ্বাস? কিসের জন্য? কাহাকে? দপ্‌ করিয়া শান্তার মনের মধ্যে জ্বলিয়া ওঠে। শান্তা

মনে মনে কোনটিকেই সমর্থন করিতে পারে না ; নেহাৎ মানিয়া লয় মতান্তর ও মনান্তরের আশঙ্কায়।

সে উত্তর করিল, "ভয় করে না। যাইনা এমনিই—কখনো যাইনি বলে।" অভিভাবকদের ঐ সঙ্কীর্ণতাটুকু প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে তাহার সঙ্কোচে বাধিল।

অতসী বলিল, "কোনদিন একটা কাজ করিনি বলেই কক্ষনো করব না, এ তো ভারি মজার কথা হ'ল। তুই বেজায় গতানুগতিক দেখচি। এমনি ধারা কল্লে রিফর্ম হয় কি করে?"

শান্তা কথা না বলিয়া হাসিল।—রিফর্ম? শুধু রিফর্ম কেন, দেশের ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আদর্শ মানব সমাজ গড়িতে হইলে আজ চাই রিভোল্যুশান্। অতসী না বলিলেও ইহা সে বুঝিতে পারে। কিন্তু শুধু বুঝিয়া তো লাভ নাই। সে শক্তি তাহার কই? এখনও তো আসে নাই! পথ কোন্ দিকে? তাহা তো জানে না। অবিচারের সামনে মাথা নত করিয়া কখনও দাঁড়াইবে না, এই তাহার সংকল্প বটে; কিন্তু কোন্‌টি অবিচার, কোন্‌টি সুবিচার, তাহা নির্ভুল ভাবে বুঝিয়া উঠিবার মত বিশ্লেষণী শক্তি সে এখনও পায় নাই। তাহার যে অবরোধ সম্বন্ধে অতসী এই মাত্র প্রশ্ন তুলিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে অবরোধের আবেষ্টন কি সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না?—পারে। তবে ওঠে না কেন আজও? আজ যদি গুরুজনদের শাসননিষেধের বিরুদ্ধে সে মাথা তোলে, তবে সত্য বুঝিয়াই হউক, ভুল বুঝিয়াই হউক, তাঁহারা অন্তরে পীড়া অনুভব করিবেন নিঃসন্দেহ। আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার গর্ব্বে স্নেহবৎসল গুরু-জনদের ব্যথিত করা কি সুবিচার? অথচ সংস্কারবশে, অন্ধতাবশে অথবা স্বার্থবশে মানুষ যদি মানুষের আত্মার অমর্য্যাদা করে, তাহা নির্ব্বিচারে

স্বীকার করিয়া লওয়াই কি ধর্ম্ম ? হউক না সে গুরুজন, তাহার ভ্রান্তি কি ছিন্ন করিতে হইবে না ?—শান্তা বুঝিতে পারে না। সিদ্ধান্ত এলোমেলো হইয়া যায়।

খানিক পরে সে বলিল, "আসল কথা কি জানিস্ ? আমার একলা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। কাকীমার তো অনেকদিন থেকেই শরীরটা খারাপ, কোথাও বেরোন্ না। দিদি থাকৃত যদি, তাহলে যেতাম।"

অতসী একটু রাগ করিল, "আমাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই, তাই বল্লেই পারিস্ ?"

শান্তা বলিল, "এবার বড়দিনের সময় দিদি দিন কয়েক থাকবে এখানে। তখন ঠিক যাব একদিন।"

"সত্যি যাবে কিন্তু ?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

অতসী বলিল, "এমনিও একদিন যাস। আবার নিউ ইয়ার্স ডে-তে আমি স্পেশাল ইন্ভিটেশান্ পাঠাবো, সেদিনও যেতে হবে।"

৭

মায়েব সঙ্গে বসিয়া শান্তা পিঠা প্রস্তুত করিতেছিল—বিকালবেলাকার খাবারের আয়োজন। দুধের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পোষা বিড়ালটা বারবার থালার চারিপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিউ মিউ করিতেছে। অনেকবার বিতাড়িত হওয়ার পরে একবার হতাশ হইয়া শান্তার গায়ের শালখানির ভূলুণ্ঠিত অংশের উপরে শুইয়া পড়িল। মাণিক কতক্ষণ ধরিয়া জীবটির উপর অকারণ উপদ্রব করিয়া জানালার গরাদের উপরে বসিযা পা দুলাইতে লাগিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ।

মাণিক লাফাইয়া উঠিল। নামিযা ছুটিয়া ঘরের বাহিরে গিযা আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, জ্যেঠিমা, বড়দি এযেছে ?"

ললিতা আদর করিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইযা ঘরের দরজায আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে নির্ম্মলবাবুও।

শান্তা সহাস্যে উভয়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিনা সম্ভাষণেই আবার হাতের কাজের দিকে মনোনিবেশ করিল। মনটা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিযাছে। অথচ ঐ খুসীর আতিশয্যে মুখের নীরবতা তাহার আরও যেন বেশী করিয়া আসিয়া পড়ে।

জামাতার আবির্ভাবে মা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্ষীরছানা সংমিশ্রিত হাত দুইখানা দিয়া তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া জামাতার শিরস্পর্শ না করিতে পারায় ব্যতিব্যস্ত।

শান্তা বলিল, "তুমি এখন ওঠো না, মা! আমি একাই এগুলো করে ফেলতে পারব। দিদি, তুই বোস্।"

মুখে স্বীকার না করিলেও তাঁহার দিদিকে একাকী কাছে পাইবার লোভ এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতে চাহিতেছিল না।

সন্ধ্যার পরে সেদিন বসিবার ঘরে গল্প জমিল। অনেক দিন পরে দেখা—ছোট খাট, খুঁটিনাটি যত অবান্তর প্রসঙ্গ, সবই আজ আলোচনার বিষয়।

ললিতা বলিল, "তোমরা গেলে না সেদিন, কাকীমা। সত্যি, আমার বড্ড খারাপ লাগ্‌ছিল। বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে একলা গিয়ে সুখ নেই।"

কাকীমা বলিলেন, "কি করে আর যাই বল্?—ছেলেটার অসুখ, শান্তার পরীক্ষা। আর তাছাড়া, তোর তাতে আফশোষ করবার কোনও কারণ ছিল না, সে আমি জানি। যে যাবার, সে সঙ্গে গিয়েছিল তো—তাহলেই হল। আমাদের যাওয়া-না-যাওয়া সাগরে জলের ছিটে!"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "ধ্যেৎ!"

"তোমরা বুঝি প্রায়ই বেড়াতে যাও, দিদি?"

"প্রায়ই আর কৈ যাওয়া হয়? বেশী সময় পাইনে তো!"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি করিস্ সারাদিন যে সময় হয় না?"

"কি যে করি তা সত্যি হিসেব দিতে পারব না। কেমন করে যেন সময়টা হুস্ হুস্ করে কেটে যায়! সকালবেলা ঘরের কাজকর্ম্মেই কাটে, দুপুরবেলা একটু খবরের কাগজ পড়ি আর সেলাই করি। এই তো! তবু—"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল তুমি অনেক বাইরের বই পড়, না?"

ললিতা বলিল, "না রে ভাই, একেবারেই পড়া হয় না!"

শান্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন?"

হাসিয়া ললিতা উত্তর করিল, "সে তোর জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করিস্। —এই তো দেখ্‌লি দিনের বেলাকার রুটিন্ বল্লাম। সময় আমার

যেটুকু সে রাতে। তা ওঁর জ্বালায় রাতে যে একটু কিছু সিরিয়াস্ ষ্টাডি করব, তার জো-টি নেই। বলেন—সারাটা দিন বাইরে বাইরে খেটে এসে বাড়ীতে যে একটু গল্প করব, তাও যদি তুমি বই নিয়ে বসে থাক, তাহলে আমাকে পালাতে হবে।”

কেনই যেন কথাটা শান্তার ভাল লাগিল না। জামাইবাবুর একটুখানি মনস্তুষ্টির জন্ম দিদি যে তাহার মানসিক চর্চ্চা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে, ইহা তাহার কাছে বড়ই অযৌক্তিক ঠেকিল। আর—জামাইবাবুকেই শুধু দোষ দিলে বা কি হইবে? ললিতার সত্য সত্য আগ্রহ থাকিলে সে বুঝি আর ঐ দুর্ব্বল ওজরটুকু কাটাইয়া উঠিতে পারিত না? অন্ততঃ দুপুরবেলাও তো সময় করিয়া লইতে পারে। নির্ম্মলের প্রতি ললিতার কৃত্রিম অভি-যোগের তলায় যে মনের একটা গোপন খুসীর ভাব স্পষ্ট হইয়া বহিয়াছে, তাহাতেই যেন শান্তার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ জাগিল। অনেক মেয়েকেই সে দেখিয়াছে, বিবাহের পর নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীকে, স্বামীর ছোটখাটো সুবিধা-অসুবিধাকে, এমন কি প্রথম প্রথম স্বামীর প্রসঙ্গকে লইয়াই একেবারে বিব্রত থাকিতে। কিন্তু ললিতাও যে তাহাই করিবে, ইহা সে মনে করে নাই। স্বামীকে ভালবাসিতে কেহ তো তাহাকে বারণ করে না! কিন্তু তাই বলিয়া এই ভালোবাসাই কি জীবনের পক্ষে এমনই সর্ব্বস্ব যে, মানুষের আর যাহা কিছু গৌরবময় উচ্চ-প্রবৃত্তি, সকলকেই এমন রাহুগ্রস্ত করিয়া দিবে? কেন, সে-ও তো দিদিকে ভালোবাসে—অনেকখানি ভালোবাসে। কই, তাহা তো তাহার প্রতিভা ও শক্তির বিকাশের পথে বিঘ্ন জন্মায় না? তাহার ভালোবাসা ও দিদির ভালোবাসার মধ্যে এমন পার্থক্য কেন? শান্তা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অনেক কিছু বড় আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবে বলিয়া ললিতা যে বিবাহের পূর্ব্বে শান্তাকে কতদিন অনুপ্রাণিত করিয়াছে, আপনার চিন্তা

প্রতিভা ও শক্তির বলে জগতের বুকে একটা সংস্কারের ঢেউ তুলিবে বলিয়া পণ করিয়াছে, ললিতার মধ্যে যে একটা তেজোময় স্বাতন্ত্র্য ছিল! এইমাত্র তাই ললিতার মুখে তাহার দাম্পত্যজীবনের ছোটখাট বিশ্রম্ভসুখের প্রচ্ছন্ন আনন্দের আভাসে সে কেমন নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "ভারি আব্দার তো! তার চেয়ে তুমিও কেন জামাইবাবুকে বল না—কাজকর্ম্মের অজুহাতে সারাদিন বাইরে বাইরে থাকলে আমার ভালো লাগে না, ওসব ছেড়ে দিয়ে এসো আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই গল্প করি?"

ললিতা ও সুষমা দুইজনেই হাসিলেন।

সুষমা বলিলেন, "নেহাৎ প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলেই পেটের জোগাড় কর্ত্তে হচ্ছে। নইলে ওই রকমটাই হত। কি বলিস্ ললিতা?"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "মনটা বাঁচিয়ে রাখা যে আরও দরকার, সে কথা বুঝি জামাইবাবু ভুলে বসে আছেন?—তুই তাঁকে বলতে পারিস্ না দিদি?"

সুষমা ললিতার দিকে কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি স্বয়ংই যে ভুলতে বসেছেন!"

দিদির পক্ষ সমর্থন করিয়া শান্তা বলিল, "ইস্!"

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "আরে একটু সবুর কর্। কিছু পরে তুই আপনিও একদিন খুসী হয়েই ভুল্বি।"

মনে মনে হাসিয়া শান্তা ভাবিল, ভুলিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন অথবা সাধ নাই।

প্রসঙ্গটি খানিক পরে চাপা পড়িল। ললিতা বলিল, "আচ্ছা শান্তা, তোর সেই লাল ব্লাউজটা এখনও আছে—যাতে সেই পদ্মের কুঁড়ি এম্ব্রয়ডারি করা ছিল? আমারটা ছিঁড়ে গেছে। ওই রকম ডিজাইনের আর একটা করব ভাবচি।"

শান্তা বলিল, "আছে বটে, অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায়।"

"তা হোক্, ওই থেকেই তুলে নেবো।—তোরটা হয়েছিল ভারি সুন্দর কিন্তু।"

কাকীমা বলিলেন, "সেলাইয়ের হাতটিই ওর চমৎকার।"

শান্তা বলিয়া উঠিল, "তুমি যদি লীলাদির সেলাই একবার দেখতে, কাকীমা! সেই টেবল্‌ক্লথটা মনে নেই দিদি? ওই যেটা এক্‌জিবিশানে দিয়েছিল?—এমন নিখুঁত সেলাই আমি কোথাও দেখি নি।"

ললিতা বলিল, "সত্যি কিন্তু।"

লীলাদি যখন ললিতাদের সঙ্গে কলেজে পড়িত, তখন শান্তার তাহাকে বড়ই ভাল লাগিত,—সে যেমন চৎকাব সেলাই করে তেমনই চমৎকার গান গায়, আবার তেমনই চমৎকার দেখিতে!

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি, লীলাদির সঙ্গে তোব আজকাল দেখা হয়? সে তো তোদের পাড়াতেই থাকে, শুনেচি!"

"হয় মাঝে মাঝে।—সে আজকাল বাইবের কাজকর্মে, প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ওয়ার্কস্ প্রভৃতি নিয়ে ভারী ব্যস্ত!" একটু থামিয়া আবার বলিল, "সেদিনও তো আমার বাড়ীতে গিয়েছিল আমাকে ওদের কাজে নামাতে —ওরা কি একটা নারীশিক্ষা সমিতি না-কি করবে বলে।"

"গিয়েছিলি?"

"না ভাই।"

শান্তা বলিল, "কেন রে?"

ললিতা একটু হাসিয়া বলিল, "আমার সাধ্যি আছে? তোর জামাইবাবু যে একদম পছন্দ করেন না!"

আবার জামাইবাবু!—

৮

অতসী তাহার নিমন্ত্রণ ভোলে নাই। যথাসময়ে বৎসরের ঠিক শেষ দিনটিতে শান্তার কাছে পত্র আসিল, পয়লা জানুয়ারী অতসীদের বাড়ী সান্ধ্যসম্মিলন, তাহাকে যাইতে হইবে। ললিতা, সুষমা মাণিক সকলেরই নিমন্ত্রণ।

সুষমা অসুস্থ শরীর বলিয়া যাইতে চাহেন না, তবু শান্তা বারবার তাঁহাকে সাধাসাধি করিল। অতসীদের বাড়ীতে যাইতে যদিও তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই, তবু তাহাদের সান্ধ্যসম্মিলন প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে সে যে মোটেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেনা, এইরূপ একটা ধারণা তাহার বরাবর আছে। এসব ব্যাপারে কাকীমাকে এবং সম্প্রতি ললিতাকেও মানায় ভালো।

সন্ধ্যার একটু পরে শান্তা ও ললিতা অতসীদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

হলের দরজা ও জানালাগুলির পুঁতির পর্দ্দা ভেদ করিয়া একটা নীলাভ আলোর রশ্মি ভাসিয়া আসিতেছে। ভিতরে নারী ও পুরুষকণ্ঠের উচ্চ-মৃদু গুঞ্জন। রেডিও-তে গানও সুরু হইয়াছে।

ললিতা ও শান্তা পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। বিনোদবাবু বলিলেন, "স্বাগতম্।" বিনোদ অতসীর বড ভাই।

অতসী চেয়ার ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, "আমি এতক্ষণ তোদের এক্স্পেক্ট কর্চ্ছিলাম ভাই।"

জানালার কাছাকাছি যে কয়েকখানা চেয়ার সাজানো ছিল, তাহারই একখানা অধিকার করিয়া বসিয়া শান্তা অলসভাবে চারিদিকে চাহিয়া

দেখিতে লাগিল। দেয়ালে টাঙ্গানো বিবিধ রকমের দেশী ও বিলাতী ছবি—কোথাও সুদূর 'সাসেক্সে'র কোন্ পল্লীপ্রান্তের একটুখানি রেখা, কোথাও প্রচণ্ড জলপ্রপাত কোথাও সমুদ্রের বুকের উপর চাঁদের অজস্র চুম্বন; জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের যে প্রকৃতির মুখখানি দেখা যাইতেছে, এগুলিও তাহার চেয়ে কম সজীব নয়। সামনের দেয়ালের ডানদিকে একখানি অর্দ্ধবিবসনা নারী প্রতিকৃতি; বামদিকের ছবিখানিও তদনুরূপ—হ্রদের তীরে উপলখণ্ডে আলুলায়িতবেশা বিবশা রমণী। গৃহখানির এই মনোরম চিত্রাবলীর মাঝখানে চারিদিকে সজীব, শোভন ও তরুণ এই মানুষগুলির চঞ্চল গতিবিধি যেন একটি কাব্যকুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে। শান্তা মনে মনে উপভোগ করিল।

অতসী পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, "বীণার গান শুনচি ভাই?"

শান্তা বলিল, "বেশ তো! বীণা কখন্ এল?"

"তোর ঢের আগে।" অতসী চলিয়া গেল। শান্তা চাহিয়া দেখিল, সমাগত মহিলাদের মধ্যে দুই চারিটি তাহার পরিচিত। বীণাকেও ঐ দেখা যাইতেছে—সোণালী রঙের রেশমী শাড়ী ও ব্লাউজ পরিয়া চেয়ারের হাতলের উপরে অর্দ্ধোপবিষ্ট। তাহার উজ্জ্বল রংয়ের উপর সোণালীটি মানাইয়াছে ভালো। ব্লাউজের মধ্যে হাতের কোনই ঝঞ্ঝাট নাই, সুতরাং সম্পূর্ণ বাহুখানিই উন্মুক্ত, রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বীণার মুখোমুখি টেবিলের ঠিক বিপরীত দিকের চেয়ারখানায় বসিয়াছে যে মেয়েটি, শান্তা তাহাকে চেনে না। সে-ও তো বেশ দেখিতে! খোঁপার ভঙ্গিটি কি সুন্দর! আবার পরণের ঈষৎ নীল ফুরফুরে শাড়ীখানির অঞ্চলপ্রান্ত বুকের উপর দিয়া কেমন সুললিত ভঙ্গিমায় টানিয়া দেওয়া হইয়াছে—মৃদু নিঃশ্বাসের তালে তালে তাহার অর্দ্ধাবৃত বুকের উপরকার মণিহারটি দুলিয়া দুলিয়া কি কমনীয়তারই সৃষ্টি করিতেছে। বাঃ!—

অদ্ভুতভাবে শান্তার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল। চারিদিকের ভদ্রমণ্ডলীর পোষাকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া গেল।—আচ্ছা, মেয়েরা এত সাজসজ্জা করে কেন? পুরুষের চেয়ে নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ কি একটু বেশী? কিন্তু ভাস্কর্য্যে, চারুশিল্পে, কবিত্বে তাহারা জগৎসভার বড়স্থান অধিকার করিতে পারে না কেন? শান্তা ভাবে, হয়ত সংসারের গুরুদায়িত্ব নারীকেই বহন করিতে হয় বলিয়া সে কলারাজ্যে কৃতিত্ব দেখাইবার তেমন অবকাশ পায়না, তাই। নহিলে তাহার এই সহজ সৌন্দর্য্যবোধ তাহাকেই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিত।—কিন্তু মীমাংসাটা তাহার মনঃপূত হইল না। আচ্ছা—ঐ যে মেয়েরা তাহাদের অৰ্দ্ধেক দেহখানিই বাহিরের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে, পুরুষের পরিচ্ছদ তেমনটি নয় কেন? নারীর দেহ কি পুরুষের চেয়ে সুন্দর? পুরুষের দৃঢ়, বলিষ্ঠ, মাংসপেশীবহুল দীর্ঘদেহকান্তি তো তাহাদের সুকোমল, সুগোল, মসৃণ তনুলতা অপেক্ষা কম সুশ্রী বলিয়া শান্তার মনে হয় না। অথচ পুরুষ তাহার দেহসৌষ্ঠব দেখাইতে তো বিশেষ ব্যস্ত নয়। শান্তার মনে পড়িয়া গেল, একদিন পাশ্চাত্যসভ্যতানুরাগী এক পরিচিত ভদ্রলোক পশ্চিমমহিলাদের বেশভূষার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'জগৎ জুড়িয়া আর্থিক সমস্যার দিনে ইউরোপীয় মেয়েদের এই বস্ত্রসংকোচ প্রশংসার যোগ্যই বটে!' কথাটা শুনিয়া শান্তার ভয়ানক হাসি পাইয়াছিল; বস্ত্রসংকোচই যদি ইহার উদ্দেশ্য, তবে ইউরোপীয় পুরুষও কেন তাহাই করে নাই? তাহাদের যে পদনখ হইতে আকণ্ঠ পোষাকে ঢাকা! মেয়েদের পরিচ্ছদের ক্ষীণতার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজিতে গিয়া সেদিন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল, আজও এই সভার তরুণীদের সৌক্ষীনতা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহার সেই কথাটাই মনে পড়িল। আপনার তরুণ যৌবনের উদ্ভিন্নশ্রীর চারিপাশে মানুষের এবং বিশেষতঃ পুরুষের

মুগ্ধদৃষ্টি টানিয়া আনিবার জন্যই কি এই আয়োজন নয়? নিজের সিদ্ধান্তে শান্তা নিজেই মনের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে কেমন যেন অপমান বোধ করিল। ছিঃ!

বীণা গান ধরিয়াছে। অতসী শান্তার পাশের আসনটিতে বসিয়া পড়িল।

উঠিয়া নামিয়া অনেকবার অনেকরকমে লীলায়িত হইয়া বীণার গান যখন থামিল, চারিদিক হইতে অজস্র প্রশংসার আর তখন বিরাম নাই।

বিনোদ বলিলেন, "ওয়াণ্ডারফুল।"

এদিকে একটু দূরে চারি পাঁচজনে মিলিয়া তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। একটি ভদ্রলোক জামার আস্তিনটা একটু গুটাইয়া টেবিলের উপরে বাহুর সম্মুখভাগ বিন্যস্ত করিয়া প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলিতেছেন, "কক্ষনো না, আর কোনও সলিউশান্ হ'তেই পারে না—"

চশমাপরা একটি যুবক প্রতিবাদ করিল, "বল্লেই হল। তুলনা করে দেখুন তো, আজকের কন্জারভেটিভ্-শাসিত ইংল্যাণ্ড আর সোভিয়েট্ রাশিয়া—কার প্রজাপুঞ্জের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বেশী? কম্যুনিজম্টা যদি—"

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এও কি একটা তুলনা হয়? ইংল্যাণ্ড গত তিনশো বছর ধরে যেরকম পীস্ফুলি ডেভেলাপ করবার সুযোগ পেয়েছে—উইদাউট্ এনি সিরিয়াস্ ইন্টারনাল কন্ফ্লিক্ট,—তাতে যে তার আর দশগুণ এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জার-শাসিত রাশিয়ার অবস্থাটা একবার ভাবুন দেখি? কম্যুনিজমের জন্ম তো দুদিনের! এরি মধ্যে সে দুনিয়াটার চেহারাখানা একেবারে বদ্লে দিতে সুরু করেছে যে!

শান্তার লক্ষ্য পড়িল এইদিকে। হৃদয়গ্রাহী আলোচনা!

ভদ্রলোকটির চোখে চোখ পড়িল।

তার্কিক-পঞ্চমের মধ্য হইতে তৃতীয় এক ব্যক্তি কহিল, "কিন্তু যাই বলুন মিঃ-মিত্র, ভারতবর্ষের মাটিতে ওসব খাপ খাবেনা। তাব মজ্জাগত হযে রয়েছে রাজভক্তি, একের আধিপত্য স্বীকার।"

সমাজতান্ত্রিক মহোদযটি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "এইসব ট্রাডিশনের প্রতি অতিভক্তি যদ্দিন আপনাবা না ছাড়বেন, পুরাতনের নাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌তেই ভালবাস্‌বেন, ততদিন আপনাদের দেশেব দুর্দ্দশা ঘুচ্‌তেই পারেনা। পৃথিবীতে যদি একটা সাম্য ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চান, তো কম্যুনিজম্‌কে বরণ করে ঘবে আন্‌তে হবেই।"

সাম্য ও শান্তির রাজ্য! কি মহৎ স্বপ্ন!—কিন্তু সমাজতন্ত্র দ্বারাই এই স্বপ্ন সফল হইবে, এ কথাটা মিত্র মহাশয যত সহজে মানিযা লইতে প্রস্তুত, শান্তা তাহা পারিল না। প্রথমতঃ, কম্যুনিজম্‌ দ্বারা অর্থনীতিক ও সামাজিক সাম্য সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা, তাহাই শান্তা ঠিক বুঝিতে পাবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয, তাহাতেই কি শান্তি মিলিবে? শান্তার বিশ্বাস, মানুষ সাম্যের খাতিরেই সাম্য চায়না, তাহার আসল উদ্দেশ্য আনন্দ। নহিলে প্রিয়জনের পাযে আপনাকে বলি দিয়াও মানুষ কৃতার্থ হয় কেন? যদি আনন্দই না মেলে, তবে শুধু সাম্য ও স্বাধীনতায় বেশী কি লাভ? বাজভক্ত প্রাচীন ভারতই হউক, অথবা প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সই হউক, ফাসিষ্ট নব-ইটালীই বল, আর কম্যুনিষ্ট্‌ রাশিয়াই বল—ব্যক্তিগত হৃদয়ের আনন্দের হিসাব নিকাশ লইলে কাহার প্রজা বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে কি? ফ্যাসিজম্‌ অথবা কম্যুনিজম্‌ বাহিরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হিসাবে প্রজার পক্ষে হিতকর হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের প্রকৃত আনন্দবিধান হিসাবে তাহার মূল্য কতটুকু? এবং তাহাই যদি না হইল, তবে তাহা লইয়া এত কাটাকাটি কেন?

অতসী হঠাৎ শান্তার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "তুই কি বলিস্ শান্তা ?"

শান্তা চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি ভাই ?"

তাহাদের টেবিলের চারিপাশেও বেশ একটু যে উৎসাহপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা জমিয়া উঠিতেছে, শান্তা তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। শিশিরবাবু বলিতেছেন, "তা আপনারা যাই বলুন, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌স্ জিনিসটা মেয়েদের পক্ষে অস্বাভাবিক স্বীকার কর্ত্তেই হবে। ওদিকে চেষ্টা করেও মেয়েরা কোথাও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।"

ললিতা অত্যন্ত বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "কোন্ ফীল্‌ডে কৃতিত্ব দেখায় নি, বলুন দেখি ? সায়ান্স বলেন যদি, আমি বল্‌ব মাদাম কুরী, ফিলজফিতে গার্গী, ভারতী, লিটারেচারে—"

শিশিরবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "গোটাকতক ধরাবাঁধা নামই আপনাদের একমাত্র সম্পত্তি। পুরুষের মধ্যে যে অসংখ্য ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ জায়েণ্টস্ দেখতে পাচ্ছেন, তার সঙ্গে এঁদের কোনও তুলনা হয় ?"

বিনয়বাবু এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "শান্তাদেবী কি বলেন এ বিষয়ে ? আপনি যে একেবারেই চুপ ?"

একটু হাসিয়া শান্তা বলিল, "তাবৎ চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" টেবিলের চারিদিক ঘিরিয়া হো হো করিয়া একটা হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল।

বিনয় বলিলেন, "বেশ, বেশ! বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। শাস্ত্রের বচন একেবারে সফল করে তুলেছেন দেখ্‌ছি ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "না, সত্যি !"

৯

কোথা দিয়া যে এই কয়টা মাস হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিয়া চলিল, তাহা লক্ষ্য করিবার শান্তার তিলমাত্র সময় হয় নাই। কেবলই পড়া, পড়া, আর পড়া! আর কিছুই যে দেখিবার অথবা ভাবিবার বস্তু এ সংসারে আছে, এমন বোধ হয় না। হঠাৎ যেদিন পরীক্ষার পালা শেষ হইয়া গেল, শান্তা হাঁফ ছাড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বসন্ত প্রায় শেষ হইয়া বৈশাখকে বরণ করিয়াছে। এমন করিয়া এবার সে তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইল? আর কয়টা দিন আগে যদি পরীক্ষাটা শেষ হইত! কী নিশ্চিন্ত আরামেই না এ আনন্দ সৌন্দর্য্যগুলি উপভোগ করিতে পারিত সে! এবারকার নিশ্চিন্ততার মধ্যে বিশেষত্ব অনেক বেশী, কারণ এবার একেবারেই নিশ্চিন্ত—চিরকালের মত। বিশ্ববিদ্যালয়কে এবার সে শেষ নমস্কার জানাইয়া আসিয়াছে। শান্তা মনে মনে ভাবিল, যাক্ বাঁচা গেল।

কিন্তু তারপর? এতদিন সামনে একটা উদ্দেশ্য ছিল, কঠোর হইলেও একটি প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। জীবনখানি একটা শৃঙ্খলায় নিয়মিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহার পরে? থাক্, এখনই সেকথা মনে করিতে শান্তার উৎসাহ হইল না। পরে যাহা হইবার, পরে হইবে। আপাততঃ বহুদিনের শ্রান্তি ও অবসাদকে একবার ঝাড়িয়া ফেলা যাউক। এক মুহূর্ত্তের তরেও সকল দায়িত্ব ও কঠোরতা ভুলিয়া যাইতে পারিলে তাহাই এখন আরাম!

সেদিন দুপুরবেলা সুষমার ঘরে বসিয়া শান্তা কাকীমাকে সূচীশিল্পে সহায়তা করিতেছে। কতগুলি টুকরা কাপড় অনেক রকম করিয়া পাতিয়া সাজাইয়া যখন যথাস্থানে সন্নিবেশ করা গেল না, তখন কাকীমা হঠাৎ

রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রভাকে নিয়ে আর পারা গেল না সত্যি! কিছু তো পারবেই না নিজে, আবার গোলমাল পাকাতেও ওস্তাদ!"

সুষমা সীবন কার্য্যে বড় সুনিপুণ, অন্ততঃ তাঁহার প্রতিবেশিনীদের মধ্যে এই রকমই খ্যাতি। সুতরাং মাঝে মাঝে এ পাশেব ওপাশের বাড়ীর গৃহিণীগন দুই একটা ফ্রক্, পেটিকোট, সার্ট, প্যাণ্ট ইত্যাদির জামা ছাটিবার অথবা সেলাই করিবার ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত কবিযা যান। সুষমাও অতিশয় প্রিয়ংবদা, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবাব মত কটুবাক্য তাঁহার মুখে সচরাচর শোনা যায় না। কাজেই দায়িত্ব বহন কবিতে হয। অবশ্য প্রভার বিষয়টি তাহা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র; প্রভা তাঁহার সমবযসী এবং প্রিয় বন্ধু, সুতরাং তাঁহার কাজগুলি তিনি প্রফুল্লচিত্তেই কবেন। তবু এই চৈত্র শেষের দ্বিপ্রহরেব গ্রীষ্মে বারম্বার ব্যর্থমনোবথ হইয়া তিনি একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

শান্তা বলিল, "তুমি বুকের কাপড়টা না জুড়ে দিলে তো আমিও আঁক্‌তে পারছি না। দেরী হলে আমার কিচ্ছু দোষ নেই, আমি প্রভাকাকীকে বল্‌ব।"

কাকীমা বলিলেন, "যত দোষ আমার! নাঃ, আমি এ পারব না কর্ত্তে।" বলিয়াই মাদুরের উপরে বিছানো কাপড়ের টুকরাগুলি হাতে কুড়াইয়া লইয়া সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "যাই প্রভাকে তার ওস্তাদি 'দেখাই গে'।"

সুষমা হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া ছাদের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

রায়দের বাড়ী একেবারে প্রিয়লালবাবুর পাশের বাড়ীটিই। শুধু যে কাছাকাছি তাহাই নয়, একেবারে সংলগ্ন—যেন একটি অতি প্রকাণ্ড অট্টালিকাকে মাঝখানে দ্বিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই বাড়ীর ছাদের

মধ্যখানে একটু অনুচ্চ দেয়ালের ব্যবধানের মধ্যেও আবার একটি দরজা উভয়ের মধ্যে যোগসূত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। দুই পরিবারের মধ্যে যদি বনিবনা না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য দরজাটি তালাবন্ধ করিয়া যোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সুষমাদের সঙ্গে প্রভাদের সদ্ভাবই এত বেশী যে, রাত্রিতেও সে দরজা কখনও বন্ধ হয় না, উপরন্তু এই দরজাটির কল্যাণে তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রভার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং মাণিক দিবারাত্র ছাদময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, আত্মপরনির্ব্বিচারে উভয় বাড়ীর জিনিসপত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া হুলুস্থুল করিয়া তোলে। প্রভা এবং সুষমা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনেও দিনের মধ্যে দশবার পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে শ্রান্তি বোধ করেন না।

সুষমা ছাদ পার হইয়া প্রভাদের দোতালায় নামিয়া আসিলেন। তাঁহার শয়ন ঘরে মানুষের সাড়া পাইয়া ঢুকিয়া দেখিলেন, প্রভা সেখানে নাই, রেণু ও কালু দুইজনে একটি ছবির বই খুলিয়া বসিয়া পাতাগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সুষমাকে দেখিয়া কালু সাগ্রহে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন কাকীমা, এটা নাকি এরোপ্লেন নয়? আমি বল্‌ছি—"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা কই রে?"

বাধা পাইয়া ক্ষুণ্ণ বালক উত্তর করিল, "ঐ ঘরে—ঐ কোণের ঘরে।" বইখানা কোলের কাছে আরও টানিয়া লইয়া বালক মনোযোগ স্থাপন করিল।

সুষমা প্রভাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তিনি গৃহসংস্কার কার্য্যে ব্যস্ত। ঘরখানির সামনে কতগুলি টেবিল, আলমারী, খাট ইত্যাদি ভীড় করিয়া আছে। ইহার মধ্যে কোনও কোনটা অন্যান্য ঘর হইতে এখানে আমদানী, কোনটাকে বা এ ঘর হইবে বহিষ্কার করা হইয়াছে। স্নানের পূর্ব্বে ঘরখানি

জলে ধোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখনও একেবারে শুকাইয়া ওঠে নাই। ভৃত্যকে দিয়া প্রভা আসবাবপত্রগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করাইতে ব্যাপৃত।

সুষমা যেমন যেমন কথাগুলি বলিয়া প্রভার উপর রাগ প্রকাশ করিবেন ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন, বিস্ময়ের আবির্ভাবে সেগুলি আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি গো! হঠাৎ এগুলোকে চেঞ্জে পাঠাচ্ছ কোথায়?"

প্রভা বলিলেন, "আর ভাই, আমার কি আজ এক মুহূর্ত সময় আছে? এই সকালবেলা টেলিগ্রাম এলো—সত্যঠাকুরপো আস্‌ছে। ঘরটরগুলো গুছিয়ে রাখ্‌তে হবে তো? আগে থাকৃতে লিখে পাঠাত যদি!"

সুষমা বলিলেন, "তোমার ছোট দেওবটি বুঝি?"

"হ্যাঁ ভাই।"

"কখন্ আসছে এখানে?"

"এই তো সন্ধ্যার ট্রেণে।"

সুষমা বলিলেন, "তা দেওর আস্‌বে একলা ব্যাটাছেলে, তাতে এত সব ওলট পালট করবার দরকারটা কি?"

প্রভা বলিলেন, "ও বাবা! এসেই যদি পরিপাটি মনোজ্ঞ ঘরখানা না পান তো নাক সিঁটুকে আমায় অস্থির করবেন। শ্বশুরমশায়ের বেজায় আদুরে ছেলে কি না!"

সত্যকাম অতিরিক্ত সৌখীন বাবুটি হইলেও হইতে পারে, তাহা সুষমা ঠিক জানেন না; তবে প্রভার যে অল্পেতেই ব্যস্তবাগীশ হইয়া ওঠা একটা স্বভাব, ইহা সুষমার পরিষ্কাররূপেই জানা ছিল। সুতরাং তাঁহার ব্যস্ততাকে একটু উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "তা বেশ। কিন্তু

তোমার জামাটি নিখুঁত না হলে যে নাক সিঁট্‌কে তুমিই আমাকে অস্থির করবে। অথচ নিজের বিষ্কেয় তো কুলোবে না তোমার আধ ফোঁটাও এসো, তোমার ফ্রকের কি করবে না করবে, দেখিয়ে দিয়ে যাও।"

প্রভা বলিলেন, "কেন কি হল আবার?"

সুষমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হয়েছে তোমার মাথা আর মুণ্ডু! দেখ তো এখন বুকের পিঠের কাপড় পাই কোত্থেকে? কী সব কেটেকুটে সদ্দারী করে ঠিক করে রেখেছ!"

প্রভা অগত্যা কাপড়ে হাত মুছিয়া সুষমাকে লইয়া পাশের ঘরে মাতুর বিছাইয়া বসিলেন। ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন, "এই শেল্‌ফ্‌টা ঐ জানালার পাশে নিয়ে গে' বসা। আমি আস্‌ছি।"

সুষমার হাত হইতে কাপড়গুলি লইয়া একটার উপর আর একটা দুই তিনবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া প্রভা সগর্ব্বে কহিলেন, "এই দেখ! ঠিক হয়েছে কি না?"

এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়াও সুষমা যাহা মিলাইতে পারেন নাই, প্রভা এত সহজে সেটা চট্‌ করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিলেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি বাকী কাপড়গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "বাঃ, বেল্টের কাপড় কোথায় গেল?" একটু হাসিয়া বলিলেন, "অত তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়!"

প্রভা বিব্রত হইয়া মিলাইতে বসিলেন।

সুষমা খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঠাকুরপো এখন কিছুদিন এখানেই থাকবে নাকি?"

"হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন তো বটেই। এম্‌-এ পড়তে আস্‌ছে কি না!"

"বি-এ ফল তো এখনও বেরোয় নি!"

প্রভা বলিলেন, "নাঃ, সে তো ঢের দেরী আছে এখনও। আসল

কথা, কলকাতায় থাকবার সখ ঠাকুরপোর বরাবর। নেহাৎ শ্বশুরমশায় তাকে ছেড়ে থাকতে চান না, তাই বাধ্য হয়ে এতদিন মফঃস্বল কলেজে থাকতে হয়েছে।”

আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া প্রভা বলিলেন, “থাক্ তবে। এখন হচ্ছে না। কাল দুপুরবেলা আমি এগুলো নিয়ে তোমার ওখানে যাব না হয়। যাই দেখি কতদূর করেচে।”

১০

সীমাহীন আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটানা একটা গাঢ় নীলের তুলিকা বুলাইয়া গিয়াছে, এত স্বচ্ছ, এত গভীর যে চক্ষু কোথাও বাধা পায় না, অথচ শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতেও পারে না। কোথাও একখণ্ড মেঘ নাই। পশ্চিম দিগন্তরেখার অন্তরালে অর্ধমগ্ন সূর্য্যের রক্তচ্ছটা কী প্রচণ্ড, অথচ তাহার দিকে তাকাইতে গিয়া চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। শান্তা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যের রশ্মিজাল চারিদিক ব্যাপিয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পাখী উড়িয়া চলিয়াছে এক, দুই, তিনটা। গতিশীল পাখার উপরে একরাশি আলো ঢলিয়া পড়িল, যেন রূপকথার সোণার পাখী।

কী পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা, কী আনন্দময় সৌন্দর্য্য। এমন সূর্য্যাস্ত জীবনে কয়টা দেখিয়াছে, শান্তা মনে আনিতে পারিল না।

মহান্ পুরুষ যিনি "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—একি তারই রূপ? মেঘমুক্ত নীলাকাশের বুকে সূর্য্য আজ এই মুহূর্ত্তে যে রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে অচঞ্চল, ভাস্বর, তেমনই বেশে কি মানুষের অকলঙ্ক হৃদয়পটে তাঁহার মুখচ্ছবি প্রতিভাত হয়? কে জানে। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিতে পারে? শান্তা নিজে তো কখনও প্রমাণ পায় নাই, হয়ত বিশ্বাসও করে না! কিন্তু আজিকার মত এই অপূর্ব্ব সন্ধ্যার অনির্ব্বচনীয় মহিমার মাঝখানে দাঁড়াইয়া। নাঃ। এ এক রহস্যময় প্রহেলিকা। বিরাট বিশ্বের বিচিত্র প্রশ্ন।

সূর্য্য নীচে নামিয়া যাইতেছে গভীর হইতে আরও গভীরে আর তাহাকে দেখা যায় না। অস্পষ্ট গোধূলির আভা নিভিয়া গেল। একটি

তারা আকাশের মাঝখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উত্তরে আরও একটি, ঐ তাহারই নীচে আর একটি। ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া অকস্মাৎ একসঙ্গে এত তারা কোথা হইতে দেখা দিল? পাৎলা অন্ধকারের আবরণের তলে যেন হীরার দ্যুতি! কত লক্ষ বৎসর আগে একদিন হয়ত ঐ কোন্ নক্ষত্রের জ্যোতি পৃথিবীর পানে যাত্রা করিয়াছিল, আজ সে আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছে একেবারে ঠিক শান্তার চোখের সাম্‌নে। ঐ আলোর ধারাটুকু বাহিয়া বাহিয়া বাহিয়া যদি বরাবর সে চলিয়া যাইতে পারে, তবে একদিন যেখানে গিয়া পৌঁছিবে, সেখানে কি দেখিবে? হয়ত শুধুই অগ্নিগোলক, হয়ত সাহারা, হয়ত পৃথিবীর মতই ফলে পুষ্পে তৃণে ভরা মাতৃভূমি, হয়ত সেখানে তাহাদেরই মত হাসিকান্নার জীবন লইয়া মানুষ, অথবা মানুষেরও চেয়ে উন্নততর অধিবাসী কি না, তাহাই বা কে জানে!

মানুষ এত কিছু আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছে, বিজ্ঞানের অভ্রান্ত, দুর্নিবার গতিবেগে যেন কোথাও কিছু আর অটল থাকিবার সাধ্য নাই! কিন্তু তবু তো আজও ঐ অনন্ত নক্ষত্রজগতের কিছুই মানুষের বুদ্ধিগম্য হইল না। জানা কিছুই যায় নাই, শুধুই কেবল চাহিয়া চাহিয়া দেখা আর যুগপৎ আতঙ্ক, বিস্ময় ও আনন্দ! কাহার মধ্যে ইহার সমাপ্তি—কোন্ দূরে ইহার সীমানা? কোথাও সীমানা আছে কি? ভাবিয়া ভাবিয়া শান্তার বুকের মধ্যে প্রেরণা, মাথার মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিল। যদি সে ইহার দুর্ভেদ্য যবনিকাকে একটুখানি তুলিয়া ধরিতে পারিত! মানুষ এতদিন যাহা জানে নাই, আজও যাহা জানিতে পারিতেছে না, সে যদি তাহারই একটি কণা জগৎকে উপহার দিতে পারিত! নহিলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি, চিরন্তন জিজ্ঞাসা কিসের জন্য? বিশ্ব সাম্রাজ্যের অংশীভূত হইয়া বিশ্বকে যদি না জানিতে পারে, মহাকালের অনাদি জীবনের স্ফুরণ হইয়া জীবনের সত্য যদি উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে তাহার

জীবনের সার্থকতা কোথায়? জড়ের মত চেতনাবিহীন হইয়া অথবা অন্ধের মত নয়ন মুদিয়া পড়িয়া থাকিবার জন্যই কি তাহার সৃষ্টি হইয়াছে? শান্তা কেমন করিয়া স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহা নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে দেখিতে পাইতেছে বিপুল অনাবিষ্কৃত রাজ্য, হৃদয়ের ক্ষেত্রে দেখিতেছে অসংখ্য জীব-জীবনের অফুরন্ত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, শোণিতের তালে তালে অনুভব করিতেছে অসাধ্য সাধনের কর্ম্মপ্রেরণা। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কি সম্ভব? অগণিত সম্ভাবনা একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া সব এলোমেলো করিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়েব পরীক্ষা সাঙ্গ হইযা গেলে সে মনে করিতেছিল, ইহার পর কি করিবে? আজ দেখিতেছে—কাজেব অন্ত নাই। বিশ্বের বিদ্যালয যে চিরদিনের জন্য চিরমুক্ত রহিযাছে, সে কথাটা স্মরণ ছিল না। কৈশোরের প্রাবম্ভ হইতেই জগতের ডাক আসিয়া একটু একটু কাণে পৌছিতেছিল, আজ সে যেন আঘাত করিল আরও বেশী স্পষ্ট করিযা, আরও বেশী জোরে। দাবী এত বহুমুখী এবং এত ব্যাপক যে এতটুকু স্বল্প জীবনে তাহাকে সফল করিযা তোলা যে অসম্ভব! কিন্তু কাহাকে উপেক্ষা কবিযা কাহাকে গ্রহণ করিবে সে? হৃদয় এবং মস্তিষ্ক কাহাকেও তো অবহেলা কবা যায় না—দুইযের সমান অধিকাব, দুইযের সমান প্রয়োজন। দিশাহাবা হইয়া শান্তা ভাবিতে লাগিল। করিবার মত কাজেব অভাব নাই; শুধু কে করিবে এবং কি করিবে, ইহাই ভাবিবাব কথা।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইযা মাথাব উপবে ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহিরে মহানগরীর কলকোলাহল—মনের মধ্যে বিরাট্ নিস্তব্ধতা।

ছাদের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ঝি ডাকিল, “দিদিমণি, বাবু আপনাকে ডাক্‌চেন।”

স্বপ্নের মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া শান্তা পিছনদিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে!—কাকাবাবু?"

"হাঁ, দিদিমণি।"

"যাচ্ছি।"

দোতালায় আসিয়া প্রিয়লালবাবুর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া শান্তা দেখিল, তিনি সেখানে নাই। ঝি বলিল, "এখানে নয় দিদিমণি, নীচে ডাক্‌চেন।"

"নীচে!!" মনের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইল। প্রিয়লাল-বাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—নীচে? ব্যাপারটির মধ্যে সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম থাকিলেও ভয়ানক কিছুই ছিল না; তবু শান্তার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। কাকাবাবুর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য ও কাঠিন্য কোথায় যে কাহার কোন্ কার্য্যকলাপে ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধান পায়, পরিষ্কার বোঝাও যায় না, কারণ তিনি মুখে কিছুই বলেন না, অথচ অসন্তোষ মনের কোণে গাঢ় হইয়া থাকে।—এইটিই শান্তার কাছে ঠেকে মারাত্মক!

নীচে নামিয়া বসিবার ঘরের দরজার পর্দ্দার এপাশে দাঁড়াইয়া শান্তা একটু ইতস্ততঃ করিল। প্রিয়লালবাবু ডাকিলেন "এসো।"

ঘরে ঢুকিয়া শান্তা দেখে, কাকাবাবুর সামনে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক। প্রিয়বাবু বিশেষ ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, "ইনি শ্রীঅপরেশ মিত্র। গত সেপ্টেম্বরে ইনি উদ্যোক্তা হয়ে নারীশক্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেচেন। তার ম্যানেজিং কমিটিতে মহিলার সংখ্যাই বেশী। তোমাকেও তার মধ্যে নেবার জন্যে ইনি এসেচেন। তা' আমি বলি—"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "যদি সম্ভব হয়, আপনাকে এর প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তে চাই।"

শান্তা কাকাবাবুর কথার সুরে যেন একটা অনিচ্ছা ও অপ্রসন্নতার আভাস পাইল। যদিও আগন্তুক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বাহিরের

লোকের বুঝিবার কথাও নয়, কারণ রেশটি এত সূক্ষ্ম যে, অতিপরিচয়ের অভ্যস্ত কর্ণকুহরে ব্যতীত উহার আঘাত ঠিক বাজে না।

ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া শান্তা দেখিল, বয়স চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ হইবে; তারুণ্যের কোঠা পার হইয়া গিয়াছেন, মুখের উপরে বেশ একটা পরিণত মনেব ছাযা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহখানির সুগঠন এবং চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটি পরিস্ফুট সতেজ ভাব। ঠোঁটের দুই পাশে কোন্ একটি বিশেষ রেখা তাঁহার মুখশ্রীতে যে বিশেষত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহা কি দৃঢ়তার, না যৌবনসুলভ আত্মবিশ্বাসের, শান্তা ঠিক বুঝিযা উঠিতে পারিল না। মোটের উপর, বাঙালী জীবনের পরিমাপ মতে তিনি এখন যৌবনের শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিযাছেন, ভিতরকার একটুখানি বিশেষত্ব না থাকিলে এতদিনে হয়ত প্রৌঢ়ত্বের কবলে পড়িয়া যাইতেন।—শান্তার মনে হইল, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু ঠিক মনে করিয়া আনিতে পাবিল না।

তাহাব মনে না থাকিলেও অপরেশ মিত্রের শান্তাকে ভাল করিয়া মনে ছিল নিশ্চযই। পযলা জানুয়ারী অতসীদের বাড়ী তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। অতসীর সঙ্গে অপরেশবাবুর আলাপ অনেক দিন হইতেই। তাহার মুখেই তিনি শান্তার গুণানুকীর্ত্তন বহুদিন শুনিয়াছেন। অতসী বলে—দেশের বা সমাজের কাজে শান্তার মত আন্তরিক উৎসাহ কম লোকেরই দেখা যায়; সে কথা বলে কম, অনুভব করে অনেক বেশী; সে যদি কখনও কাজে নামে, তবে তার মত আদর্শ কর্ম্মী আর পাওয়াই যাইবে না, ইত্যাদি। অপরেশবাবু হয়ত কিছু কিছু বিশ্বাস করিয়া থাকিবেন, শান্তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হইয়া ধারণা হয়ত একটু বদ্ধমূল হইয়াছে, অথবা এমনই একটা কিছু। সুতরাং প্রিয়লালবাবুর কাছে

সোজাসুজি চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সভ্য মনোনীত করিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে।

এখানে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, নারীজাতির উন্নতিকল্পে যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কর্তৃত্ব যথাসম্ভব নারীর উপরে নির্ভর করিলেই ভাল। এতদিন সুবিধামত মহিলাকর্ম্মী সব পাওয়া যায় নাই বলিয়া অনেকগুলিই কাজই কয়েকজন ভদ্রলোককে মিলিয়া করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি ব্যারিষ্টাব-কন্যা শ্রীমতী অতসী এই সঙ্ঘের সেক্রেটারীর ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং অনেকটা তাঁহার নিকট অবগত হইয়াই তিনি শান্তাদেবীর সহায়তা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সম্মতি লইতে আসিয়াছেন।

প্রিয়লালবাবু এদিকে বিশেষ রাজি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি একটু আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—শান্তা স্বভাবতঃই একটু সঙ্কোচ-শীলা, বাহিরের কাজকর্ম্মে কখনও যোগ দেয় নাই, কাজেই।—কিন্তু অপরেশবাবু সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া যুক্তি দেখাইলেন যে, আসল কাজকর্ম্ম যাহা কিছু তাহা তিনি স্বয়ং করিতে প্রস্তুত—যেমন এ কয়মাস করিয়া আসিয়াছেন; ইঁহাদের শুধু নামতঃ কার্য্য করিতে হইবে; বাহিরে ঘোরাফেরা বিশেষ কিছু প্রয়োজন হইবে না, মাঝে মাঝে শুধু দুই একটা মিটিংয়ে যোগদান করিতে হইবে মাত্র। প্রিয়লালবাবু তথাপি বলিলেন—কিন্তু শান্তা ডাক্তার হইলেও অল্প বয়স্ক, এ সব কাজের ভার কি একটু প্রবীণ মহিলার উপরে ন্যস্ত করিলেই ভাল হয় না?

অপরেশবাবু ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন—তাহা শান্তাদেবী নিশ্চয়ই পারিবেন, অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি শিক্ষিতা মহিলা, দুই চারিদিনের মধ্যেই সব বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখুন না তিনি নিজে রাজি আছেন কি না।—

শান্তার নিজে রাজি হওয়া-না-হওয়ার যে কোনও মূল্য থাকিতে পারে, এ কথাটি প্রিয়বাবুর কাছে নিতান্ত হাস্যকর! সে ছেলেমানুষ, সে বোঝে কি? বিশেষতঃ, তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও মতামত যে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার আদৌ আসে না। তিনি দুই চারিবার নানারকম করিয়া অপরেশের প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তাকে উপর হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শান্তা কাকাবাবুর মনোভাব জানে, এক্ষেত্রেও অনেকটা বুঝিয়াছে; নিজে কি বলিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অপরেশ শান্তার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আশা করি, আপনার কোনও আপত্তির কারণ হবে না! মিস্ চৌধুরী আপনার ইন্‌টিমেট্ ফ্রেণ্ড শুনেছি, তিনি এর সেক্রেটারীরূপে এটিকে সাহায্য কর্ত্তে রাজি হয়েছেন।"

শান্তা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, সে জন্যে নয়, তবে—" আসল কথা, মনে মনে যতই তাহার কর্ম্মস্পৃহা থাকুক্ না কেন, বাহিরে নামিয়া হৈচৈ করিয়া ব্যস্ততা দেখাইতে তাহার বড় লজ্জা করে। অধিকন্তু নিজের শক্তির ওজন না জানিয়া কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তাহার কেমন কুণ্ঠা আসে।

মিঃ মিত্র বলিলেন, "আপনি নিজেও তো লাঠি ছোরা খেলায় পারদর্শী শুনেচি। আপনার তো তাহলে এমনিতেও এতে ইন্‌টারেস্‌টেড হওয়া উচিত!"

একথা আবার ভদ্রলোক জানিলেন কোথা হইতে? নিশ্চয় অতসীর কাণ্ড!—পিতার জীবিতকালে শান্তা এই জাতীয় শরীর চর্চ্চায় কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতা আসিয়া অবধি আর সুবিধা হয় নাই, অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিষ্টতা সহকারে হাসিয়া শান্তা বলিল, "ওঃ, সে বহুকাল আগেকার কথা। ও কিছু নয়।"

প্রিয়লালবাবু প্রস্তাবটিকে শেষ করিয়া দিবার সুরে বলিলেন, "তার চেয়ে আমি বলি, আপনারা এঁর চেয়ে অভিজ্ঞতর কোনও মহিলাকে ধরুন।"

অপরেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অপরিচিত এক ভদ্রলোক তাহার সহকর্ম্মিতার উপযাচক হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেও শান্তার সঙ্কোচবোধ হইতেছিল। অথচ কি বা করা যায়? পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনও কাজে সহায়তা করিতে পারিলে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। আজ খোলা আকাশের নীচে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই কয়েক মিনিট আগেকার অনুভূতি ও প্রেরণাগুলি এখনও যে তাহার মনের মধ্যে স্পন্দিত হইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু জন-হিতকর অনুষ্ঠানের নামে যাহাদিগকে কোমর বাঁধিয়া নামিতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মনে প্রকৃত জনসেবা অপেক্ষা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সা দেখিয়া দেখিয়া শান্তার কেমন ভয় হইয়া গিয়াছে, পাছে ইহাদের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া সে-ও ঐ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু অপরেশবাবুর একান্ত আগ্রহকে উপেক্ষা করিবার মত অপ্রিয় বাক্যটুকু যে তাহার মুখে যোগাইতে চায় না।

জোর করিয়া নিজের অনিচ্ছাকে দূর করিবার চেষ্টা করিয়া শান্তা একবার ভাবিল, সম্মতি দিলেই বা ক্ষতি কি? মানুষকে একটুখানি সাহায্য করিবার সুযোগ পাইলেও যদি তাহা না করে সে, তবে তাহার কেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা?

কিন্তু তবু—!

দ্বিধার কারণ আরও একটু আছে, এবং সেইটিই প্রধান কারণ। শান্তা নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল। সে জানে, কাকাবাবুর ইহাতে আপত্তি। তাঁহার বিরোধিতা করিতে কি সে সাহস করে? করিতে যাইবেই বা কেন? এই প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ দিবার জন্য আগ্রহ তাহার এমন কিছুই নাই, যাহাতে সে এত বড় দুঃসাহসের কাজটি করিতে অগ্রসর হইবে। সে যদি অপরেশ মিত্রের প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায়, তবে প্রিয়লাল বাবু মুখে হয়ত বলিবেন না কিছু, কিন্তু দিবারাত্র তাঁহার অভিভাবকত্বের তলায় থাকিয়া তাঁহার অপ্রসন্ন, কঠোরভ্রূভঙ্গি শান্তা সহ্য করিতে চায় না। এমনিই সে কাকাবাবুকে যা ভয় করে!

আচ্ছা, কাকাবাবুরই বা এত আপত্তি কেন? মেয়েদের ব্যায়ান-চর্চ্চাতে তাঁহাব কিছুমাত্র আপত্তি নাই, শান্তা জানে। কাজেই প্রতিষ্ঠানএর উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। তবে?—জনসাধারণের কাজে যোগ দেওয়াতে যদি আপত্তি থাকিত, তবে তিনি নিজে কখনও তাহাতে অগ্রসর হইতেন না, অথচ শান্তা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছেন—প্রিয়বাবু অমুক অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য, অমুক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি। তবে তাহার বেলায় এ আপত্তি কিসের? কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু কাকাবাবু যাহা করিতে পারেন, তাহাই কি করিবার অধিকার তাহারও আছে? কাকাবাবুর সঙ্গে তাহার কি তুলনা হয়?

হয় না!! কেন হয় না? সে মেয়ে বলিয়া? শান্তার মনের মধ্যটা হঠাৎ শক্ত হইয়া উঠিল। এ কী রকম অন্যায়? অত্যন্ত অসঙ্গত, অবিচার! কিন্তু কি করিবে? প্রিয়লালবাবু অসঙ্গত কিছু বলিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার মত স্পর্দ্ধা তাহার কি আছে?

সে চুপ করিয়া টেবিলের উপরের কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে

লাগিল। অপরেশ ঈষৎ ক্ষোভের সহিত প্রিয়লালবাবুকে বলিলেন, "তাহলে এঁর সহায়তা কোনমতেই পাওয়া গেল না?"

প্রিয়বাবু একটু উৎসাহ দিবার সুরে বলিলেন, "এঁর চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য অন্যের কাছে পাবেন আশা করি।"

অপরেশবাবু প্রায় উঠিবার উপক্রম করিয়া সোজাসুজি শান্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনার ফাইনাল্ ডিসিশান্‌টা আমায় জানিয়ে দিন ফাইগুলি।"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া শান্তা ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা, আমি রাজি।"

প্রিয়লালবাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

মিত্র মহাশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ভেরি মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড্।— আপাততঃ আপনার বিশেষ কিছুই কর্ত্তে হবে না, 'মিস্ চৌধুরী' অনেকটা ভার নিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেই শক্তিমন্দিরের ম্যানেজমেণ্ট্ সম্বন্ধে ডিটেল্‌স্ সব জান্তে পারবেন। প্রয়োজন মত আমিও এসে আপনাকে ইন্‌ফরম্ কর্ত্তে পারব। আপনার কিছু ভাবতে হবেনা।"

১১

প্রিয়লাল সকালবেলা একবার কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিতে বেলা হইল। প্রায় সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কাপড় ছাড়িয়া স্নানের উদ্যোগ করিবেন, দেখিলেন যথাস্থানে কাপড়চোপড় পাওয়া যাইতেছে না। উদ্দেশে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার তোয়ালে কোথায় রেখেচ? কাপড়ও দেখ্‌চি না যে!"

ঘর হইতে বাহির হইয়া সুষমা বলিলেন, "তোমার দেরী হচ্চে দেখে বাথরুমে রেখে এসেছি সব।—আমার ফ্রকের কাপড় এনেছ?"

হাসিয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "একদম ভুলে গেছি।"

সুষমা রাগিলেন, "খুব করেছ! এই তিনদিন ধরে অনবরত তোমায় বল্‌ছি! এখন কি করি বল তো?"

প্রিয়লাল বলিলেন, "আজ বিকেলবেলা ঠিক এনে দেব।"

"বিকেলবেলা এনে দিলে তা নিয়ে আমার মুণ্ডু কোরব! বিকেলবেলা তো ওর ওখানে যেতেই হবে।"

নিজের ত্রুটি হইয়া গিয়াছে অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। প্রিয়লাল একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া একটু বিব্রত হইয়া ভাবিলেন। অতঃপর বলিলেন, "তা ভুলে গেছি এখন কি করব? আর কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আমার আর একটুও টাইম নেই, আমি নাইতে চল্লাম। এগারোটা পনরেতে ক্লাস।"

ব্যস্তসমস্ত ভাবে তিনি চলিয়া গেলেন।

সুষমা একবার শান্তার ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর অমনোযোগিতার উপর

কিছুক্ষণ ঝাল ঝাড়িয়া রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে আবার বাহির হইয়া আসিলেন।

বারান্দায় আসিয়াই দেখিলেন—সত্যকাম। সত্যকাম হাসিমুখে বলিল, "ব্যাপার কি বৌদি? কার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন?"

সুষমা একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া অনুযোগের সুরে উত্তর করিলেন, "আর কার? দেখ তো, আজ বিকেলবেলা আমার এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ তার মেয়েব জন্মদিন উপলক্ষে, তাকে একটা কিছু প্রেজেণ্ট দিতে হবে তো? তাঁকে কদ্দিন ধরে বল্‌ছি একটা সিল্কের পিস এনে দাও—তো আজ অবধি এসে পৌছুল না! এখনও কাপড় পর্য্যন্ত হাতে না পেলে কখন্ সেটা সেলাই করব, কখন্ বা দেব?—ছিঃ, কি রকম বিশ্রী হবে!"

সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, "এক্ষুণি চাই?"

বিরক্তি ও হতাশামিশ্রিত সুবে সুষমা বলিলেন, "আর চাই!"

সত্যকাম বলিল, "আমাকে দিন্ না—আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি!"

প্রায় যেন অকূলে তরী পাইয়া সুষমা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তথাপি সৌজন্যের খাতিরে বলিলেন, "তুমি এনে দেবে কি! তোমাব এখন নাওয়া খাওয়ার সময় না?"

"[illegible]র আবার নাওয়া খাওয়ার সময়? আজকাল কি আর সমযের কিছু ঠিক আছে আমার?—দিন্ আমায। কি রকম কাপড় চাই আপনার?"

সুষমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া রাজি হইলেন, "আচ্ছা তাহলে। যদি যদি দিশী সিল্ক ভালো পাও তবে তাই এনো—দেড় গজ। বুঝলে?"

"কি রং হবে?"

"টুক্‌টুকে লাল পাও ভালো, নয়ত যে কোনও রং তোমার পছন্দমতই এনো।" সুষমা টাকা বাহির করিতে দেরাজ খুলিলেন।

মাণিক সত্যকামের পাঞ্জাবীর আস্তিন ধরিয়া টানিয়া আব্দার করিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব সত্যকাকা।"

অর্দ্ধেক অন্যমনস্কভাবে অথচ সন্তর্পণে গরদের আস্তিনটি মাণিকের কবল হইতে ছাড়াইয়া লইতে লইতে সত্যকাম বলিল, "কোথায় যাবে? আমি বেড়াতে যাচ্ছি না তো—দোকানে যাচ্ছি।"

"দোকানেই যাবো তাহলে তোমার সঙ্গে।"

"আচ্ছা, মাকে জিজ্ঞেস করে এসো।"

বারান্দার ওদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কালু বলিল, "ছোটকাকা —আমিও।"

ধমক্ দিয়া সত্যকাম বলিল, "যা যা শীগ্‌গির বাড়ী যা—মা বকবেন।"

সুষমা আসিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট সত্যকামের হাতে দিলেন। মাণিক মায়ের আঁচল ধরিয়া বলিল, "মা, আমি সত্যকাকার সঙ্গে যাই?"

কালু এদিকে শক্ত করিয়া কাকার হাত ধরিয়াছে।

সত্যকাম নোটখানা হাতে লইয়া উভয় বালকের হাত এড়াইয়া দিল ছুট্; "খেলা কর বসে।—লজেন্স দেব।"

দিন দশেক হইল, সত্যকাম কলিকাতা আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে সুষমাদের সঙ্গে বেজায় আত্মীয়তা জমাইয়া ফেলিয়াছে: যেন কতদিনের চেনা। একশ্রেণীর ছেলেমেয়ে দেখা যায় যাহাদের পরকে আপন করিতে বেশী সময় লাগে না। নদীর মত চঞ্চল তাহাদের গতি, নদীর মত মুখর হাস্য, নদীর মতই যে পথ দিয়া চলিয়া যায় চারিদিক একেবারে উর্ব্বর করিয়া দিয়া যায়। এই ধরণের জীবনগুলিই সাধারণতঃ মানুষের প্রিয় হয় বেশী, কারণ তাহা সকলকে সজীব করিয়া রাখে এবং তাহার পরিমাপ আয়ত্তের মধ্যে। জলাশয় হিসাবে নদীর চেয়ে সমুদ্রেরই শ্রেষ্ঠতা বেশী, কিন্তু সমুদ্রের অতল গভীরতার রহস্যোদ্ভেদ করিতে গিয়া মন বিস্ময়ে ও

আতঙ্কে যেন থমকিয়া দাঁড়ায়; তাহার চেয়ে সাধারণ জীবন-যাত্রার পক্ষে অনতিগভীর এবং গতিশীল প্রাণের মূল্যই বেশী। সত্যকাম এই ধরণের যুবক—প্রিয়ভাষী, স্ফূর্তিপ্রিয়, সদাই উচ্ছ্বসিত। তাহার একহারা ছিপ্‌ছিপে, লম্বা গড়ন এবং চঞ্চল চাহনি—সব কিছুই যেন ভিতরকার স্বভাবটিরই অনুমোদন করে। সুষমাকে প্রভার সমান আত্মীয়তার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত করিতে তাহার দেরী হইল না। ইন্দুমতীকে বৌদি সম্বোধন করিলে নিতান্ত যেন তরুণের দলে আনিয়া ফেলা হয়, তাই তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে বৌঠান্ বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। সুষমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটিবার কারণ আরও একটু ছিল,—সুষমা নিজেও অনেকটা তাহারই মত লোকসঙ্গপ্রিয় ও অমায়িক।

আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে সত্যকাম আসিয়া হাজির। হাত হইতে কাগজের মোড়কটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, পছন্দ হল কি না?"

সুষমা সাগ্রহে তুলিয়া লইলেন, গেরুয়ার উপরে মস্ত মস্ত জাপানী পাখার ছাপ, "বা—এঁশ হয়েছে!"

মাণিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আমার লজেন্স কই?"

সত্যকাম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলে, "রোস, দেব এখন।"

মাণিক তাহার পিঠে চড়িয়া বলিল, "দা—আ—আও।"

"বিকেলবেলা দেব।"

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া মাণিক কাঁধ হইতে নামিয়া পড়িল।

সুষমা কাগজসুদ্ধ কাপড়ের ছিট্‌টি দেরাজে ঢুকাইতে ঢুকাইতে বলিলেন, "ভাগ্যিস্ আমার এমন কাজের ঠাকুরপোটি পেয়েছি।"

হাসিয়া সত্যকাম বলিল, "ঈস্!"

টেবিলের কাছে বসিয়া শান্তা একখানা চিঠি পড়িতেছিল। অতসী লিখিয়াছে—আজ একবার তাহাদের ওখানে যাইতেই হইবে। অনেকদিন শান্তা যায় নাই, তাহার সঙ্গে অনেক গল্প জমা হইয়া আছে। তা ছাড়া অতসী দুই একদিন পরে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাইবে, মাস দুই সেখানে থাকিবার কথা। সুতরাং ইহার মধ্যে একদিন দেখা না হইলেই নয়। অতসী তাহার জন্য 'কার' পাঠাইয়া দিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু ব্যারিষ্টার মহাশয়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজনবশতঃ সেখানা বিকালবেলা খালি পাওয়া যাইবে না, কাজেই সে শান্তাকে স্বয়ং আসিতে অনুরোধ জানাইতেছে। মোটের উপর শেষ কথা এই যে, যেমন করিয়াই হউক, আজ তাহার আসা চাই-ই, নইলে অতসী ভয়ানক রাগ করিবে।

চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরিতে পুরিতে শান্তা দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যকাম। পরণে তার পাৎলা ফিন্‌ফিনে পরিষ্কার একখানি সরুপেড়ে ধুতি, গায়ে ধবধবে শাদা পাঞ্জাবী, প্রত্যেকটি ভাঁজ যেন সদ্য খোলা হইয়াছে, গলার বোতামটাও খোলা। আধুনিক কায়দা-কানুনের কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই। শান্তা যখনই তাহাকে দেখে, আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, সর্ব্বক্ষণ বেশভূষায় এমন পারিপাট্য ছেলেটি বজায় রাখে কেমন করিয়া?

সত্যকাম সুষমার উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। শান্তার দরজার কাছাকাছি হইতেই তাহার গতি মন্থর হইল, সত্যকাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "গেজেট এনেছি, দেখবেন?"

শান্তা দেখিল, সত্যকামের হাতে এক তাড়া কাগজ।

উৎসুক হইয়া বলিল, "কই, দেখি!" নিজের পরীক্ষা পাশের সংবাদ বহুপূর্ব্বেই শান্তার জানা ছিল, তবু পরীক্ষার্থীর গেজেটের উপর বিষম লোভ।

সত্যকাম ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর গেজেট নামাইতেই শান্তা সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিল ইংরাজী অনার্সের তালিকা। অতসী প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছে—করিবে যে তাহা শান্তা আগে হইতেই জানে—তবে একেবারে নীচে। ঠিক তাহার নামের নীচেই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানে যে নামটি চোখে পড়িল, তাহার তলায় আঙুল দিয়া শান্তা সত্যকামের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "এ আপনি, না?"

সত্যকাম হাসিল।

শান্তা দেখিয়া চলিল। আর সত্য টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিযা একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে ছড়ানো এলোমেলো বইগুলির মধ্যে আঙুল নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সত্যকাম স্বভাবতঃ বাক্‌পটু। মনের ভিতরটা অত্যন্ত সরস, সুতরাং উর্ব্বর; কাজেই তাহাতে কথার অঙ্কুর ডালপালাসমেত গজাইযা উঠিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, একটিবার বীজ পড়িলেই হইল। কিন্তু শান্তার সম্মুখে আসিযা সে অদ্ভুতভাবে বাক্যহীন হইয়া পড়ে, কারণ শান্তা নিজে বড় কম কথা কয়। তাহাকে দেখিলেই সত্যকাম অনুভব করে, সে যেন বড় বেশী দূরে। বাস্তবিক পক্ষে, শান্তা যে কথা বলিলে উত্তর দেয় না, অথবা সত্যকামের সান্নিধ্য হইতে নিজেকে বাচাইয়া বাঁচাইয়া চলে, তাহা নয়। সত্য স্বয়ংও এ অপবাদ তাহাকে দিতে পারে না। যে কয়টা কথা শান্তা এ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে বলিয়াছে সত্য গুণিয়া গুণিয়া দেখিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি হাসিমুখে—কোথাও রূঢ়তা, অহঙ্কার অথবা সঙ্কোচ প্রকাশিত হয় নাই। তবু কেন যেন তাহাকে এত গম্ভীর ও আয়ত্তের বাহিরে মনে হয়, সত্যকাম বুঝিতে পারে না। শান্তা সাধিয়া কখনও

তাহার সহিত কথা বলে নাই—তেমন প্রয়োজনই বা হইয়াছে কই ? এবং প্রয়োজন না হইলে শুধু গল্পের খাতিরে গল্প করিবার মত ঘনিষ্ঠতাও তাহার সঙ্গে শান্তার হয় নাই। কিন্তু কেন যে হয় নাই, তাহাই সত্যকামের কাছে ভাবিবার বিষয়। শান্তার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে চিন্তা করিয়া প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সত্যকাম অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত কথা পাড়িবে, তবে তাহার তরফ হইতে প্রত্যুত্তর মিলিবে। এ রকম করিয়া কাঁহাতক পারা যায় ? মাঝে মাঝে ইহাতে সত্যকামের অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। কিন্তু বাদ দিতেও পারে না, শান্তার ঐ বিশেষত্বটুকুর জন্যই। এ যাবৎ যেখানেই যাহাদের সঙ্গে সে মিলিত হইয়াছে, আপনার প্রাণপূর্ণ গতিবেগে সকলকে ভাসাইয়া লইতে দেরী হয় নাই। এইখানে বাধা পাইয়া নদীস্রোতের মতই তাহার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত জাগিয়া উঠিতেছে। সহজে যদি নিজের পথে বহিয়া যাইতে পারিত, তবে সত্যকামের মনে শান্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার কোনও সম্ভাবনা হয়ত ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, শান্তার প্রতিই লক্ষ্য পড়ে তার সব চেয়ে বেশী। নিজের সঙ্গে তাহার প্রভেদ এত অধিক যে, সত্যকাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহার সাথে কেমন ব্যবহার করিতে হইবে।

খানিক পরে সত্যকাম বলিল, "আপনি ফিলজফি অনার্স নিলেন কেন ? খুব ভালো লাগে বুঝি ?"

"হ্যাঁ—খুব।"

"আমার কিন্তু মোটেই না।"

শান্তা একটু হাসিল।

একটু পরে আবার সত্যকাম জিজ্ঞাসা করে, "এম্-এ পড়বেন ?"

শান্তা বলিল, "না—হবে না।"

"কেন ?"

কাকাবাবু অথবা মা, কেহই যে তাহাকে ইউনিভার্সিটিতে গিয়া পড়িতে দিতে সম্মত নহেন, তাহা শান্তা জানে। কেন—তাহাও জানে। এমন করিয়া তাহার পড়াশুনাতে বাধা পড়াতে তাহার মনের মধ্যে ক্ষোভ রহিয়াছে প্রচণ্ড। কিন্তু গুরুজনদের এই প্রাচীনোচিত সঙ্কীর্ণতাকে লোকের কাছে প্রচার করিয়া ফিরিতে তাহার সাধ নাই—অবর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সে বলিল, "এম্‌নিই।"

কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না।

বিকালবেলা সেদিন শান্তা সকাল সকাল হাত মুখ ধোওয়া শেষ করিল। প্রিয়লালবাবু কলেজ হইতে ফিরিলেই তাঁহার কাছে অতসীর আহ্বানপত্রের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার সহিত রওনা হইবে। অতসী কি কি বই চাহিয়াছে,সেগুলি আলমারী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গুছাইয়া রাখিল। চুল বাঁধিয়া কাপড়-চোপড় নামাইয়া একবার ইন্দুমতীর কাছে আসিয়া বসিল. "আজ বোধ হয় ফিরতে একটু রাত হবে মা।"

কিন্তু প্রিয়বাবু এখনও ফিরিতেছেন না যে। অন্যান্যদিন চারিটার বেশী কিছুতেই হয় না, আজ সাড়ে চারিটাও বাজিয়া গিয়াছে। যেখানে অতি আশা সেখানে ভোজন নষ্টই হয়—শাস্ত্রের বচন। শান্তা মনে করিল, তাহার ভাগ্যেও বুঝি আজ তাই। খানিকক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সুষমার কাছে গিয়া বলিল, "কাকীমা, কাকাবাবু আজ এত দেরী করচেন কেন বল্‌তে পারো ?"

"আজ ওঁদের প্রোফেসার্স যুনিয়ান্ না-কি একটা আছে রে!"

উৎকণ্ঠিত হইয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরতে কত দেরী হবে জানো ?"

"সন্ধ্যে নাগাৎ ফিরবেন বোধহয়।—কেন রে ?"

শান্তা বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ !"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো ?"

"বাঃ, অতসীর ওখানে যেতে হবে যে আমার! কাকাবাবু না এলে নিয়ে যাবে কে ?—"

সুষমার মনে পড়িয়া গেল, "ও-হো ! তাইত !"

সন্ধ্যার সময় কলেজের পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিলে আবার যে তৎক্ষণাৎ প্রিয়বাবুকে কাজে পাঠানো সেটা বড়ই অসঙ্গত হইবে, ব্যাপারটিও এমন অত্যাবশ্যক কিছুই নয়। এজন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে শান্তার সঙ্কোচও হইবে, সাহসেও কুলাইবে না। সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। না গেলে অতসী সত্যই রাগ করিবে, ইহাও ভাবিবার কথা। অতসী তো বোঝে না, তাহার মত শান্তার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ গতি নাই—তাহাকে সব-কিছুর জন্যই অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় !

ক্ষুণ্ণমনে শান্তা বলিল, "কি করব তাহলে, বলনা কাকীমা ?"

"আর একটু অপেক্ষা করে ছাখ্ না,—আমি দেখ্ছি—উনি না এলে আর কি বন্দোবস্ত করা যায়।"

শান্তা কতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় হতাশ হইয়া ছাদে চলিল। রেলিংয়ে ভর করিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কাকাবাবু কখন্ আসেন। আসিলেও আজ আর যাইবার বিশেষ ভরসা নাই। রাস্তায় গাড়ীঘোড়া, মোটর ট্রাম কত ছুটিতেছে—একটা কিছু আশ্রয় করিয়া সে সোজাসুজি চলিয়া গেলেই তো পারিত। এত হাঙ্গামা কেন? অনর্থক কেন যে মানুষ এত অসুবিধার সৃষ্টি করিতে ভালবাসে। না যাইতে পারিলে তাহার এবং অতসীর মনস্তাপ, অথচ লইয়া যাইতে হইলে কাকাবাবুর বৃথা পরিশ্রম।

পিছন হইতে সত্যকাম কথা কহিল, "ইন্টেরাপ্ট্ কর্ত্তে পারি ?"

বিশেষ চমকিত না হইয়া ধীরে পশ্চাৎ ফিরিয়া শান্তা বলিল, "কেন ?"

সত্যকাম একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। থতমত খাইয়া বলিল, "না—কিছু নয়। এম্‌নি।"

শান্তা একটুখানি হাসিয়া আবার আগের মত রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইল।

সঙ্কোচে ও ক্ষোভে সত্যকামের মনটা যেন একটু কেমন করিয়া উঠিল। করিবার কথাও। অন্য কেহ যদি তাহার উপস্থিতিকে এমন করিয়া অবহেলা করিত, তাহা হইলে হয় আপনার সহজ চাঞ্চল্যের অপ্রতিহত গতিতে মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাহাকে জয় করিয়া লইত, নয় ও অসন্তুষ্ট ও অবমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিত। কিন্তু শান্তার কথা স্বতন্ত্র! শান্তার নির্লিপ্ত ব্যবহার তাহার অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এ যে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা নয়, অন্ততঃ এটুকু সত্যকাম বুঝিতে পারে। তাই সান্ত্বনা!

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, "কেউ আসবেন নাকি ? কারো জন্যে ওয়েট্ কর্চ্ছেন মনে হচ্ছে ?"

"দেখচি কাকাবাবু আসেন কিনা। আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার দরকার ছিল, কাকাবাবু এলে পরে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।"

"মিস্ চৌধুরী বুঝি ?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "কি করে জান্‌লেন ?"

সত্য হাসিয়া উত্তর করিল, "চোখ, কাণ, বুদ্ধি সবই একটু একটু আছে, তাই!"

রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তা উদ্‌গ্রীব, পরে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।—"নাঃ, আজ আর হবেনা। ভারি মুস্কিলেই পড়লাম দেখ্‌চি!"

সত্যকাম বলিল, "খুব দরকার বুঝি ?"

"দরকার ? হ্যাঁ—একরকম দরকারই ছিল বটে।"

"চলুন না, আমি দিয়ে আস্‌তে পারি। অবশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—"

শান্তা বিপদে পড়িল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না—আমার—আমার আর আপত্তি কি ? তবে—থাক, আপনি মিছিমিছি আবার যাবেন কি কর্ত্তে ?"

"থাক্ তবে।"

সত্যকামের ছোট্ট এই কথাটুকুর ভঙ্গিতে একটা খোঁচা ছিল, শান্তার কাণে গিয়া তাহা বিঁধিতে দেরী হইল না। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, "আমার তেমন বেশী জরুরী দরকার নেই সত্যি।"

আসল কথা শান্তা জানে। প্রিয়বাবু কখনই তাহাকে এত অল্পদিনের পরিচয়ে সত্যকামের মত অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে একাকী কোথাও যাইতে দিতে রাজি নহেন। সে যদি এখন সত্যকামের সাথে অতসীদের বাড়ী চলিয়া যায়, তাহা হইলে প্রিয়বাবু তাহার মুখের সামনে হয়ত কিছু ভৎর্সনা নাও করিতে পারেন। কিন্তু তাহার আচরণ সম্বন্ধে প্রিয়বাবুর মনের মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সংশয় লুকাইয়া থাকিবে, ইহা শান্তার দুঃসহ। তাহাতে তাহারও অপমান, বেচারী সত্যকামেরও অপমান। সুতরাং উপায় নাই।

সত্যকাম আর কোনও কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। মনের মধ্যে ভারি রাগ হইতেছিল। বাল্যকাল হইতে অতি আদরে প্রতিপালিত সে সহজেই বড় অভিমানী—কাহারও এতটুকু অনাদর বা উপেক্ষা সহিতে পারে না। এই মেয়েটি কি বলিয়া তাহাকে অবহেলা দেখাইতে সাহস করিল ? অবিশ্বাস করিল ? কথাগুলি বারবার মনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পঞ্চাশ রকমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সত্য তিল জমাইতে জমাইতে তাল গড়িতে বসিয়া গেল।

কতক্ষণ রেলিংয়ের নীচের উঁচু জায়গাটা পায়ের চটি দিয়া ঘসিতে ঘসিতে খানিকটা চুণ সুরকি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, "আমরা আর মানুষ নই, না?"

এইটুকু ক্ষুদ্র ব্যাপারের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সত্যকামের মনুষ্যত্বের এমন কি অবমাননা ঘটিল, শান্তা অর্দ্ধেক বুঝিল, অর্দ্ধেক বুঝিল না। বুঝিল এইটুকু যে, এই প্রত্যাখ্যানের মূলে প্রিয়লালবাবুর পক্ষে যাহা কারণ, সেই মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কোনও সুসভ্য মানুষের পক্ষেই অপমানকর হয়, অন্ততঃ তাহার নিজের পক্ষে তো! সত্যকামও যদি সেই অপমান অনুভব করিয়া থাকে, তাহা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। কিন্তু বুঝিতে পারিল না এই যে, সত্যকামের মত চঞ্চল ও লঘুস্বভাব তরুণটি এতখানি তলাইয়া দেখিল কি করিয়া, এবং তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

সত্যকে ভুলাইবার চেষ্টায় শান্তা হাসিয়া বলিল, "খুব বেশী বকম মানুষ বলেই তো আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিতে লজ্জা করে। আমার তো এমন কিছু দরকার নেই। বন্ধুর বাড়ীতে যাচ্ছি—বুঝতেই পাবেন—"

অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া সত্য বলিল, "ওই প্রিবাবাব আসছেন।—যান্, এবারে যেতে পারবেন।"

১৩

কতকগুলি চিঠিপত্র, কাগজ, নামের তালিকা ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে অতসী বলিল, "নাও, এবারে কিছুদিনের মত কাজ-কর্ম্মের ভার তুমি বুঝে নাও, আমি পালাই।"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ফন্দি মন্দ নয়। নিজে উদ্যোগ করে কাজ আরম্ভ করে শেষে বেচারী আমাকে ফাঁপরে ফেলা কেন?"

"আ—ভারী তো দুটো মাস! তুই ভাই সত্যি একরকম ফাঁকি দিয়ে দিয়েই নেতৃত্ব করছিস্।"

"ফাঁকি দিতে পারলে কে ছাড়ে বল্?"

অতসী বলিল, "না সত্যি। তুই মোটে যেন গা করছিস্ না, কেন বল্ তো?"

"সত্যি কথা বল্ব, অতসী? আমার প্রথমদিন থেকেই এ সবের মধ্যে ঢোক্‌বার তেমন আগ্রহ ছিল না। রাগ করিস্ নি ভাই।"

"তবে তোকে ঢুকতে কে বলেছে শুনি?"

হাসিয়া শান্তা উত্তর করিল, "তুমিই!"

"কক্ষণো না!"

"সত্যি বল্‌ছি!—তুই এ শক্তিমন্দিরের সেক্রেটারী হয়েছিস্ না নিঃসন্দেহ ভালোই হবে, এই ভরসায়ই এলাম।"

কৃত্রিম অবিশ্বাস দেখাইয়া অতসী বলিল, "আঃ—হা হা!—আচ্ছা, এলিই যখন, তখন দরদ দিয়ে খাট্‌ছিস্ না কেন শুনি?"

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্তা এবার বলিল, "প্রাণ দিয়ে খাট্‌তে ইচ্ছে করে তার জন্যে, যা দিয়ে মনোমত ফল পাব বলে আশা হয়। তুই

তো জানিস্, আমি চাই মানুষের দুঃখময় জীবনের একটা আমূল প্রতীকার। চারদিকে দেশ জুড়ে, জগৎজুড়ে অনবরত যে ব্যথার কান্না শুনছি, একেই যদি নির্ম্মূল কর্ত্তে না পারি, তবে কোন্ কাজে কি লাভ? এই যে শক্তি-মন্দিরের কাজে আমরা যোগ দিয়েছি, এতে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে তোর মনে হয়?"

অতসী বলিল, "গোড়াতেই অতবড় আশা করাটা তোর অন্যায় ভাই। যতটুকু করা যায় সেই লাভ। আমরা কত বড়ই বা মানুষ—একেবারে একদিনেই পৃথিবীসুদ্ধু ওলট্পালট্ করা কি আমাদের কাজ?"

"সে কথা আমিও অস্বীকার করিনে। শুধু ছোট কাজ কেন—সবার চোখের আড়ালে অজানা থেকে কাজ কর্ত্তেও আমার আপত্তি নেই। পৃথিবী সুদ্ধু লোককে আনন্দ দিতে নাই-ই পারলাম, যদি শুধু একটিমাত্র মানুষকেও সত্যিকার আনন্দের স্পর্শ অথবা সন্ধান দিয়ে যেতে পারি, তাতেই আমার জীবন ধন্য মনে করব। কিন্তু আমি বলতে চাই কি জানিস্? সত্যিকার আনন্দের—চিরন্তন সুখের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হলে যে পথের দরকার, আমাদের এই কাজ কি সে পথে চলছে?"

অতসী তাহার সহিত ঐকমত্য স্বীকার করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আনন্দের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হলে কোন পথটা তুই উপযুক্ত ঠাউরেছিস্ বল্ তো?"

"সেইখানেই তো খট্কা। বুঝতে কিছুই পারছি না, কেবল ক্রমাগত বুঝবার চেষ্টাই করছি।"

"চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তেই যদি জীবনটা সারা হয়ে যায়, তবে কাজ করবি কবে ভাই?"

শান্তা বলিল, "তাহলে কাজ করাই হবে না!"

হাল ছাড়িয়া দিয়া অতসী বলিল, "তবে দেখচি, তোর এর মধ্যে আসাই ভুল হয়েচে ! কেন এলি ভাই ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ঐ যে বল্লাম !—নারে, আরো একটা কারণ ছিল। অপরেশবাবু নেহাৎ অপরিচিত এক ভদ্রলোক হয়ে যে-রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, তাঁকে ফেরাতে বড্ড লজ্জা করল। কাজটাতে যখন দোষের কিছুই নেই, তখন প্রত্যাখ্যান করে অনর্থক একটি লোককে অপ্রীত করি কেন ?"

অতসী বলিল, "তবু যা হোক ?"

চেয়ারের হাতলের উপর দিয়া অনাবৃত সুগোল বাহুখানি এলাইয়া দিয়া সে একটু হেলিয়া বসিল।

মুহূর্ত্ত কয়েক জানালা দিয়া আনমনে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শান্তা বলিল, "সে যাক গে'।—তুই এ ক'মাসে অনেক অনেক নাকি ছবি এঁকেছিস্, আমাকে দেখাস্‌নি তো ?"

"আজকে সব দেখাব'খন। তোকে না দেখালে আমার আর্টের তারিফ করবে কে ?"

স্মিতমুখে শান্তা উত্তর করিল, "তাই তো !"

"জানিস্ আমার এ কদিনে আরও কত বিদ্যে বেড়ে গেছে ?"

"কি রকম ?"

অতসী উঠিয়া গিয়া কাচের কবাট্-লাগানো আলমারীটা খুলিয়া বাহির করিয়া আনিল খান দুই মখ্‌মলের আস্তরণ। শান্তা সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল—সোণার সূতায় আঁকা পদ্মবনের কোণ ঘেঁসিয়া প্রকাণ্ড রাজহংসী। বাস্তবিক, শিল্পকারিণীর নিপুণতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। রঙের বৈচিত্র্য নাই, অথচ আলো ছায়ার রেখাগুলি কেমন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শান্তা প্রশংসাভরে বলিল, "বা—বাঃ !"

অতসী বলিল, "আর একটা কি করব জানিস্ ?—মনে নেই, সেবার আর্ট গ্যালারীতে একটা ছবি দেখেছিলাম—সেই যে মাটিতে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌ছে এক পূজারিণী, পাশে পড়ে রয়েছে ছিন্নবীণা ?"

শান্তা কৌতুক করিয়া বলিল, "বেজায় রকম কবিত্ব হবে দেখ্‌চি !"

অতসী হাসিল। সেলাইগুলি আবার ভাঁজ করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল, "সব চেয়ে বেশী কবিত্ব যেটাতে হবে, সেটা তোকে প্রেজেণ্ট করব ঠিক্ করেছি—তোর বিয়েতে।"

শান্তা হাসিল, "তা মন্দ কি ?"

কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বিয়ে করবি অতসী ?"

কৌতুকহাস্যে সে উত্তর দিল, "নিশ্চয়।"

"সত্যি ?"

"কেন নয় ?"

পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া আন্তরিক ভাবে শান্তা বলিল, "বিয়ে করলে তোর আদর্শের বিকাশের পক্ষে কোনও বাধা হবে বলে মনে হয়না ?"

"বাধা ? কেন ভাই ?" অতসী বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, "পৃথিবীতে যত কিছু বড় কাজ দেখ্‌চি, সবই কি বিবাহিত লোকেই সাধারণত কর্চ্ছেনা ?"

"বিবাহিত লোকে করচে বটে, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোকে করচে কিনা দেখতে হবে !"

অতসী বলিল, "তার মানে হচ্ছে—এখন পর্য্যন্ত বড় বড় কাজের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা এম্‌নিতেই কম, কাজে কাজেই বিবাহিতের সংখ্যা আরও কম। তবু তো দেখাতে পারি মাদাম কুরী বিবাহিত, উভয়ভারতী মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী।"

শান্তা চুপ করিয়া ভাবিল। বলিল, "আমার মনে হয়, ওদের

এক্‌সেপ্‌শন্যাল্‌ মেরিট্‌। এরকমটা আশা কর্ত্তেই পারি না। আমি তো বলি, মেয়েদের মধ্যে যে পুরুষের সমান প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় না, তার কারণ—বিয়ে কর্লেই মেয়েদের মস্তিষ্ক-চর্চ্চার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা পড়ে, অথচ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিয়ে প্রায় সবাই করে। খুব সাধারণ দু' একটা কথা কল্পনা করেই দেখ না—কাণ্ট্‌ তাঁর দার্শনিক উপলব্ধিতে পাগলের মত ঘরছাড়া উদাসভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারেন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঘরে যদি গিন্নী থাকেন এক রেজিমেণ্ট্‌ ছেলেপুলে নিয়ে, তবে তাঁকে তো আর অমন উদাসিনী সাজ্‌লে চলবে না। আইন্‌ষ্টাইন্‌ দরজা ভেজিয়ে নিরালা ঘরে নিজের গণিতগবেষণার বিপ্লবতরঙ্গে যখন দিশেহারা হয়ে থাকেন, তাঁর স্ত্রীকে তখন তো লক্ষ্মী বৌটি সেজে গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে মন দিতে হয়—স্বামী তাঁর বিজ্ঞানমন্দির থেকে উঠে এসে কি খাবেন! এ নইলে তো সর্ব্বনাশ!" একটু হাসিয়া বলিল, "আমার খুব বিশ্বাস এর অভাবেই আইন্‌ষ্টাইন্‌ তাঁর প্রথমা গণিতজ্ঞা স্ত্রীকে বরদাস্ত কর্ত্তে পারলেন না।"

অতসী ঠিক উপযুক্ত প্রতিবাদ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না। তবু অবিলম্বে চট করিয়া বলিল, "ইচ্ছে থাকলে অর্থাৎ মনের জোর থাক্‌লে কোনও কিছুতেই আটকায় না। মেয়েদের উচিত বিবাহিত জীবনে তাদের বাইট্‌ এ্যাসার্ট করা।"

"মনের জোর থাকলে সব বাধাই যদি অতিক্রম করা যায়, তবে বিয়ের প্রলোভনটাই বা যাবে না কেন ভাই? আমার কিন্তু মনে হয়, বিয়ে করে দশগণ্ডা সন্তান-সন্ততি নিয়ে তারপরে মনের জোর খাটাতে গিয়ে তাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা দেখানোর চেয়ে গোড়াতেই থামা ভালো। বিয়ে না করাতে কোনও ক্ষতি তো নেই?"

নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের জন্যই, না তর্কে জয়লাভ করিবার খাতিরে, না শান্তাকে চটাইবার লোভে, বলা শক্ত, অতসী একটু হাসিয়া বলিল,

"বিয়ে করাটা মানুষের—বিশেষতঃ মেয়েদের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে, না করে উপায় কি ?"

কথাটা শান্তার আদৌ ভাল লাগিল না। চেয়ারে নড়িয়া একবার সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুই বিশ্বাস করিস্, অতসী ?"

অতসী আবার হাসিল, "না বিশ্বাস করে কি করব বল্ ? বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা যা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, তার ওপরে কথা কইলে লোকে পাগল বলবে যে ! আচ্ছা, হ্যাভেলক্-এলিসের 'সাইকলজি অব্ সেক্স্' পড়েছিস্ তুই ?"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া শান্তা বলিল, "না পড়িনি—পড়বার প্রবৃত্তিও হয়নি কোনকালে !" কী এক জঘন্য অপমান ও ঘৃণার অনুভূতিতে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল—শরীর সুদ্ধ যেন শিহরিয়া উঠিতে চায়। একথা আজ সে নূতন শোনে নাই, কিন্তু ইহার আলোচনা তাহার স্পষ্টভাবে এই প্রথম। ইহার যথার্থ স্বরূপ তাহার কাছে আজ যেন নির্ল্লজ্জভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। প্রচলিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে সে কোনমতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চায় না। ইহা যে সমস্ত নারীজাতির অপমান ! আর সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিলেও এই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য যে তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে ! প্রাচীন শাস্ত্রকার বলিয়াছিলেন—নারী নরকের দ্বার, আজ বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য বৈজ্ঞানিকও প্রমাণ করিবেন তাহাই !! নিষ্ফল ক্রোধে ও ক্ষোভে শান্তার কপালের শিরা যেন দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। এ যদি সত্যই হয়, তবে কোন্ নির্ম্মম বিধাতার ক্রূর পরিহাস এ ? পাপপুণ্যের বিচারবিশিষ্ট প্রতিভা দিয়া, সুখ-দুঃখের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় দিয়া, অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তির সূক্ষ্ম উপলব্ধিময় আত্মা দিয়া—সর্ব্বোপরি সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন বিকট

দৈহিক লালসার আলোড়নকে—যে তাহার কুহক কালিমার স্পর্শে আর সকল প্রেরণা লুপ্ত করিয়া দিবে ? ইহা যে ধারণারও অতীত ।।

অতসী অবাক্ হইয়া দেখিল, শান্তার চক্ষু দিয়া যেন স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া পড়ে পড়ে। সে হাসিয়া বলিল, "এত এক্‌সাইটেড্ হলি কেন ভাই ? এ তো অস্বীকার করবারও জো নেই, স্বীকার কর্লেও নূতনত্ব কিছু হয় না—চিরকালের জানা কথা।"

মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া যথাসম্ভব নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্তা বলিল, "ভাবছিলাম, চিরকালের জানা কথা বলেই একে মানতে হবে কিনা। আমি বুঝতেই পারিনা, পুরুষ দেহের ওপর যতটা সংযম আনতে পারে, নারী কোথায় কোন্ যুগে তার চেয়ে কম সংযম দেখিয়েছে।"

অতসী বলিল, "অবস্থার ফেরে পড়ে অনেক জায়গাতেই মেয়েদের আরো বেশী সংযম পালন কর্তে হয়েছে, সত্যি। কিন্তু সায়েন্টিস্টরা কি বলেন জানিস্ তো—ওটা নাকি মেয়েদের শরীরধর্ম্মের একেবারে বিরুদ্ধ, ওতে ভেতরে ভেতরে অনেক ক্ষতি হয়।"

শান্তার মন আবার কঠোর হইয়া উঠিল। বিদ্বেষপূর্ণ অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও পুরুষের মনগড়া সায়ান্স। লেবরিটারীতে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের দেহমন বিশ্লেষণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু বাইরে থেকে দার্শনিক চোখ নিয়ে যতদূর দেখেছি—চিরকাল সব জীবের মধ্যে পুরুষ জাতেরই ঐ প্রবৃত্তিটা প্রবল ভাবে প্রকাশ পেয়ে আসচে। অস্বীকার কর্তে পারিস্ অতসী ?"

অতসী হাসিয়া বলিল,"আমি অস্বীকার কর্তে যাব, আমার কি দায় বল ?"

শান্তা চুপ্ করিল। বলিয়া বুঝাইবার অথবা প্রমাণ করিবার সাধ্যও তাহার নাই। তার প্রয়োজনই বা কি ? অন্যে যাহা খুসী মনে করুক, সে নিজে কখনও বিশ্বাস করেনা, করিতে পারে না।

১৪

সকালবেলার আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

শান্তা নীচে প্রিয়লালবাবুর বৈঠকখানা ঘরের পাশে একটি কক্ষে অপরেশের সহিত কথা বলিতেছে। ঘরখানা আয়তনে ক্ষুদ্র। ইতঃপূর্ব্বে এটি ছিল অব্যবহার্য্য—যত রাজ্যের পুরাতন বাজে বইয়ের গাদা এবং ভাঙা খাটপালঙ্কের অংশ স্তূপাকার হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল এইখানে। সম্প্রতি ইহাকে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ প্রিয়বাবুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও শান্তা যখন একবার শক্তিমন্দিরের সংস্রব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সেই সম্পর্কে মাঝে মাঝে দুই একজন বাহিরের ভদ্রলোকের আগমন সম্ভাবনা আছে বৈ কি? অপরিচিত আগন্তুককে সরাসর উপরে লইয়া যাওয়া একান্তই অসঙ্গত, বাহিরের ঘরের সকল লোকের অবাধ দৃষ্টির সম্মুখে যখন-তখন শান্তাকে বাহির করিয়া আনাও একান্ত অশোভন। সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রিয়লালবাবু হিন্দুনারীত্ব ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধন করিয়া অন্তঃপুর স্বর্গের রহস্যছায়া এবং কর্ম্মমুখর মর্ত্ত্যের প্রকাশ্য দিবালোকের মাঝখানে আবিষ্কার করিয়াছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থানরূপে এই ঘরখানি।

অপরেশ বলিলেন, "নেক্স্ট্ মিটিংয়ে আমি এই প্রস্তাবটি তুলব ঠিক করেছি, কেননা যত শীগ্গির শীগ্গির করা যায় ততই ভালো।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "সবাই মত দেবেন তো?"

"নিশ্চয়! এতে আপত্তি তুলবার তো কারো কোনও গ্রাউণ্ড দেখ্ছি না, সবাই না দিলেও অধিকাংশই দেবেন।"

"কিন্তু আমার তো বিশ্বাস এটা আপাততঃ না হলেও চল্তে পারে।"

অপরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কি করে চলবে ? কোনও কিছু নতুন ইম্প্রুভ্মেণ্ট কর্ত্তে গেলেই টাকার দরকার।"

"তা মানি। কিন্তু দেশে টাকার যখন এত টানাটানি, তখন যতদূর সম্ভব ব্যয়সংকোচ কর্ত্তে চেষ্টা করাটাই ঠিক নয় কি ?"

অপরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে তো বটেই। তবে যেগুলো দরকার সেগুলো কর্ত্তেই হবে তো ? এই কমাস ধরে শক্তিমন্দিরের কাজ যে চল্ছে, সে কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে চলা—দেখতেই পাচ্ছেন। বাইরের কোনও রকম শ্রীবৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। আজকাল ছাত্রীসংখ্যা হিসাবে যে রকম উন্নতি দেখতে পাচ্ছি, তাতে ঘরে বাইরে উভয়তঃই একটু পরিবর্ত্তন না কর্লে চলবে কেন বলুন ?"

শান্তা উত্তর দিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। অপরেশের প্রস্তাবে তাহার সম্মতি বিশেষ ছিল না, কিন্তু ইতোমধ্যেই আরও দু'একদিন তাঁহার সহিত শান্তার মতান্তর প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং নিত্যই এই ভদ্রলোকটিকে সব ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতে তাহার বাধে।

তাহাকে মৌন দেখিয়া অপরেশ বলিলেন, "কি বলছিলেন—বলুন না ? আপনার মতামত জান্তেই তো এসেছি।"

"ভাবছিলাম দরকারটা একেবারেই অপরিহার্য্য কি না। আপনি যাকে ইম্প্রুভ্মেণ্ট বলছেন, আমার মনে হয় তার অনেকটাই অনাবশ্যক।" সসঙ্কোচে এইটুকু বলিয়াই সে অপরেশের মুখের দিকে তাকাইল।

অপরেশবাবু মনে মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ করিলেন, একটু ধাক্কাও খাইলেন। তাঁহার নিজের আগ্রহাতিশয্যেই শান্তা তাঁহার শক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মতের অনৈক্য। শান্তা সাধিয়া কোথাও কোনও বিষয়ে প্রভুত্ব করে না, বরঞ্চ অনন্যসাধারণ বিনয়ের সঙ্গেই কথা বলে। এজন্য অপরেশবাবু

তাহাকে পছন্দ করেন খুব। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখা যায়, অপরেশ যাহা সঙ্গত বলিযা মনে করে, শান্তা মনে করে ঠিক তাহার বিপরীত। ইহাতে তিনি বিরক্ত হন না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন।

শান্তা দেখিল, অপরেশ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া আছেন। নিজের আচরণে কোনরূপ রূঢ়তা প্রকাশ হইয়া পড়িল কি? তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "আমার যা মনে আসে তাই বলে ফেলি—কিছু মনে করবেন না সেজন্যে। মতামত জিজ্ঞেস কর্লে'ন, তাই বল্লাম। হয়ত আমার ভুলও হতে পারে বুঝতে।"

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, "যা মনে আসে তাই বল্‌বেন নাতো কি করবেন? ফ্রাঙ্কনেস্ জিনিসটা আমি বড্ড ভালোবাসি। সরলভাবে মনের কথা খুলে না বল্লে অনর্থক অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়।"

"আমিও তাই বলি।"

"আচ্ছা, বলুন তাহলে আমার প্রস্তাবটা আপনার অনাবশ্যক কেন মনে হয়?"

শান্তা বলিল, "আপনি সভ্যদের চাঁদা এবং ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের ভর্ত্তির খরচ, দুটোই বাড়াতে চাচ্ছেন। সভ্যদের চাঁদার হার বাড়াতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কারণ যাঁরা একটা মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ করে অনুষ্ঠান করেছেন, তাঁদের এর মধ্যে কিছু কিছু স্যাক্রিফাইস কর্ত্তে হবে বৈকি? কিন্তু যারা শিখতে আসছে, তাদের ওপরে বোঝা চাপানো আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। তাতে করে ব্যবসায় বুদ্ধির ভালো নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরোপকার ব্রতের অনুপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায় না।"

"তা হলে ব্যয়সংকুলান হবে কি করে?"

"ব্যয়সংক্ষেপ করুন!"

অপরেশ বলিলেন, "ব্যয-সংক্ষেপ কোনমতেই যে করা যাচ্ছে না, আপনিও তো দেখ্‌ছেন।"

শান্তা বলিল, "চেষ্টা থাকলে যায়। এই ধরুন, আপনি বলচেন—শক্তিমন্দিরের ব্যায়ামার্থীদের একটা আলাদা য়ুনিফর্ম্ম দেবেন, যাতে তাদের বাইরে একটা বিশেষত্ব থাকে। আমি বলি এটা একেবারে নিরর্থক। আপনি বলচেন, দিনকে-দিন যে রকম উন্নতি হচ্ছে, তাতে আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীটাতে স্থানাভাব হয়ে পড়চে, অন্যত্র বড় রকমের একটা বিল্ডিংয়ে তুলে নিতে হবে। আমি তো দেখচি, স্থানাভাব যা হচ্ছে তা ব্যায়াম শেখানোর নয়,—সে হচ্ছে বড় অফিসঘর, সেক্রেট্যারিয়েট্ টেব্‌ল, ভিজিটার্স্ রুম্, মাননসই রকম লাইব্রেরী ইত্যাদির। কেমন, নয়?"

অপরেশ বলিলেন, "কেন যে এগুলো প্রয়োজনীয় নয়, আমি তো বুঝতে পারছি না। ছোট বড় সব ব্যাপারেই একটখানি টেস্ট থাকা ভালো নয়?"

"ভালো হতে পারে, কিন্তু অপরিহার্য্য নয়। যেখানে পেটের অন্ন জোটাতেই মানুষের গলদঘর্ম্ম, সেখানে বাইরের রুচির দিকে এত জোর দিলে চল্‌বে কেন বলুন?" একটু হাসিয়া বলিল, "বিলিতি হাওয়া এত বেশী এসে আমাদের গায়ে লেগেছে যে, অনাড়ম্বর কোনও অনুষ্ঠান যে বৃহৎ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে, এ কল্পনাটাও উড়ে গেছে।"

বিলাত ফেরৎ অপরেশের কাছে কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না।

অপরেশ বাম হাতখানিতে চেয়ারের হাতলের উপর ভর করিয়া তাহাতে মুখ ঠেকাইয়া ক্ষণকালের জন্য মাথা নীচু করিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে শান্তার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তাঁহার মৌনদৃষ্টির গভীরতায় হঠাৎ যেন শান্তা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অপরেশবাবু বলিলেন, "যখনই যে কাজ আমি হাতে নিয়েছি, জলের মত স্বচ্ছন্দগতিতে চলে গেছে, কোথাও বিশেষ ঠেক্‌তে হয়নি। প্রথম বাধা পেতে সুরু কর্লাম আপনার কাছে।"

শান্তা বলিল, "একসঙ্গে কাজ কর্ত্তে গেলে একে অন্যের ভুল সংশোধন না করে দিলে কি ভালো হয়? অবশ্যি, ভুল যে আপনারই আমার নয়, এমন কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি নে।"

গম্ভীরভাবে অপরেশ বলিলেন, "হুঁ।"

শান্তা কোনও উত্তর করিল না।

অপরেশ বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না—কিন্তু আমি গৌরব করে এটুকু আমার সম্বন্ধে বলতে পারি যে, আমার ইচ্ছাশক্তির সামনে কখনও কোনও বাধা স্থায়ী হয়নি। আমার বিশ্বাস, আপনাকে আমি কন্‌ভিন্‌স্‌ড্‌ করাতে পারব।"

শান্তা মনে মনে হাসিয়া বলিল, "চেষ্টা করে দেখতে পারেন!"

"বেলা হয়ে গেছে, আজ উঠি এখন।" আলোচনার অর্দ্ধপথেই অপরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, "আসব আর একদিন।"

দরজার কাছাকাছি গিয়া ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আসি তাহলে—নমস্কার।"

শান্তাও উপরে চলিয়া আসিল। দোতালার সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখে—বারান্দায় সত্যকাম ও মাণিকে বিষম যুদ্ধ চলিযাছে। সত্যকামের হাতে একটা মস্তবড় লাল টুকটুকে গোলাপ—তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া সত্যকাম মুখ ফিরাইয়া দেখিল—শান্তা। সুতরাং যুদ্ধোদ্যম প্রশমিত করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হইল না—প্রিয়বাবু অথবা ইন্দুমতী তো নন্—হাসিয়া সে আবার মাণিকের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইল। শান্তাও হাসিমুখে আপন মনে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মাণিক অর্দ্ধেক হাসিয়া অর্দ্ধেক কাঁদিয়া অনুনাসিক কণ্ঠে নালিশ জানাইল, "দেখ—দিচ্ছে না—"

তাহার সুরের অবিকল অনুকরণ করিয়া সত্যকাম প্রতিধ্বনি করিল, "দেখ—দিচ্ছে না—"

ক্ষেপিয়া গিয়া বালক তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়া সত্যকামের উরুতে দিল এক ঘুসি। সত্য সত্য তাহার কতটুকু লাগিল সন্দেহের বিষয়, কিন্তু সত্যকাম "উ—হুঃ" বলিয়া এক লাফে তিনহাত পিছাইয়া গিয়া গোলাপসুদ্ধ হাতখানি উঁচুতে ধরিয়া বলিল, "দেব না—কক্ষণো দেব না!"

মাণিক নিরুপায়। হঠাৎ কি একটা উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছুটিয়া গিয়া ঘর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিল—হাত দুইখানি পিছনে রাখিয়া লুকাইয়া। তাহার নিজের ক্ষুদ্র কলেবরের অন্তরালে অত বড় মোড়াটি যে কোনমতেই লুকাইবার নয়, ততখানি সূক্ষ্মবুদ্ধি তাহার হয় নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ভঙ্গিমায় মৃদুহাস্যে

ওষ্ঠাধর বঙ্কিত করিয়া সে সন্তর্পণে মোড়াটি সত্যকামের পায়ের কাছে নামাইয়াই তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইবে, অমনি সত্যকাম পা দিয়া সেটাকে ফুটবল করিয়া দিল দূরে ছুঁড়িয়া। ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া এবার মাণিক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেই সুরু করিল, "দেখ মা, সত্যকাকা কি কর্চ্ছে—।"

সত্য হাতখানা নীচু করিয়া আনিয়া মাণিকের মুখের প্রায় সামনে ফুলটি নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নেবে?—নাও।"

মুহূর্ত্তে ক্রন্দন থামিয়া গেল। সাগ্রহে মাণিক হাত বাড়াইতেই সত্য হাসিয়া হাতসুদ্ধ সরাইয়া ফেলিল—মানুষকে উত্যক্ত করিতে সে অত্যন্ত পটু। এবার মাণিকের অসহ্য হইল, সে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া সত্যকাম হাসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া বলিল, "চল, তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি, সেখানে অনেক ফুল আছে।"

দূরের ঘর হইতে ডাক শোনা গেল, "মাণিক, চান্ করবি আয়।" সুষমা বাহির হইয়া আসিলেন।

মাণিক বলিল, "আমি কাকার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"এই দুপুরে আবার বেড়ানো কি রে? আয়।"

সত্যকাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, "মিনিটখানেক আগে ওর সঙ্গে আমার একপালা হয়ে গেল কিনা, তারই সন্ধিস্বরূপ ঘুষ হচ্ছে।"

মাণিকের সঙ্গে সত্যর প্রায়ই মাঝে মাঝে এ রকম কুরুক্ষেত্র বাধিয়া থাকে। সুষমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এখনও কি ছেলেমানুষী যে কর ঠাকুরপো।"

"ছেলেমানুষী করব না তো আমি বুড়ো হয়ে গেছি নাকি?—সত্যি বৌদি, এক কুড়ি বয়স পেরিয়ে এলাম, তবু মনেই হয় না, বড় হচ্ছি। ভয়ানক চঞ্চল আমি, না?"

মাণিককে কোল হইতে নামাইয়া তাহার মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া সত্যকাম গোলাপগুচ্ছটি হাতে দোলাইতে দোলাইতে শান্তার ঘরের দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে পূবের জানালা দিয়া রোদ আসিয়া লুকোচুরি করিতেছে। স্নিগ্ধতা নাই, বড় প্রখর। তবু শান্তা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। কপালে, গালে উত্তাপ আসিয়া লাগিতেছে। কইন্ই-এর উপর ভর করিয়া হাতের উপর মুখ রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দেখিতেছিল। কত গাড়ী ঘোড়া, কত ট্রাম মোটর ছুটাছুটি করিতেছে, কত লোক। অশ্রান্ত কাজের গতি।

সত্যকাম বলিল, "আসব ?"

শান্তা ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "আসুন।"

ঘরে ঢুকিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ্ টিপিয়া দিয়া সত্যকাম বলে, "বেশ গরম পড়েছে আজ, না ?"

হাসিয়া শান্তা উত্তর দিল, "তা ছাড়া, এক্ষুণি আপনি যা হুটোপুটি করে এলেন—গরম লাগবার কথাই বটে।"

"ওটা আমার স্বভাব—কি করব বলুন ?"

কতক্ষণ দুইজনেই চুপ, শান্তা কথা বলিতে জানে না, সত্যকাম ভয় পায়।

সত্যর বড় অস্বস্তি ঠেকিতে লাগিল। শান্তা সামনের দরজা দিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া, সে-ও একবার ঘাড় ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইল, কিন্তু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার মত কোনও বস্তু চোখে পড়িল না—মাণিকও নাই, বাড়ীর পোষা বিড়ালটাকে পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না! কতক্ষণ শান্তার অন্যমনস্ক মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সত্যকাম বলিল, "কি ভাবছেন ?"

"বিশেষ কিছুই না!" বলিয়া শান্তা পাশের চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, একটা মৃদু নিঃশ্বাস পড়িল।

সত্যকামের কাণে তাহা গেল হয়ত। অনেকক্ষণ অলসভাবে চিন্তাস্রোতে মন ভাসাইয়া দিয়া হঠাৎ যখন মানুষ সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া জাগ্রত জগতের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসে, তখন এমন দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতেই যে বাহির হইয়া আসে এ তথ্যটা সত্যর ছিল বোধ হয় অপরিজ্ঞাত। সে বলিল, "বল্‌বেন না—তাই বলুন।"

শান্তা কৌতুক অনুভব করিল, হাসিমুখে উত্তব কবিল, "আচ্ছা তাই-ই!"

ইহার পরে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। তথাপি সত্যকাম কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়া বলিল, "আপনাদের সব কিছুই হেঁয়ালি।"

"হেঁয়ালি কে নয়? কোনও মানুষই কোন মানুষেব সবটা বুঝতে পারে না—আমিই কি আপনার সব জানি?"

সত্য বলিল, "আপনাকে না জান্তে দেওযাব মত আমার কিছুই নেই।"

"আমারও নেই।"

সত্য চুপ করিল।

শান্তা কথা ফিবাইযা বলিল, "নূতন কলেজ কেমন লাগছে?"

"ভালই!"

"আপনাদের ক্লাসে আপনারা ক'জন?"

সত্য বলিল, "ওঃ—ঢের! প্রায দেড়শ'খানেক ছেলে, পাঁচটি মেযে।"

কলেজের কথা উঠিয়া পড়াতে সত্যকামের পথ সুগম হইল। তবল ভাবে অনেক-কিছু বাজে কথার অবতারণা করিয়া ফেলিল। এবারে তাহার স্বচ্ছন্দ গতি! তাহার ঐ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায়, হাস্যমধুব কণ্ঠে সে যাহা-কিছু বলিযা যায়, সবই শুনিতে লাগে বেশ। তাহাব অনর্গল বাক্য-স্রোতের মধ্যে আর কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ না দিলেও শ্রোতার তাহাতে অরুচি ধরে না।

খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া বলিল, "যাই বেলা হয়ে গেছে। অনেক বাজে বক্‌লাম!" সত্যকাম দুয়ারের কাছে পৌছিতে শান্তা বলিল, "আপনার ফুল ফেলে চল্লেন যে!"

সত্য একবার গোলাপটির দিকে একবার শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "থাক্‌লই বা!"

অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া সে টক্ টক্ করিয়া ছাদের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

বেলা বাড়িয়াছে; হাতেও করিবার মত কাজ কিছুই নাই। শান্তা টেবিলের উপরের বই-খাতাগুলি বারকয়েক নাড়িয়া চাড়িয়া গোলাপফুলটি হাতে লইয়া বহুক্ষণ গন্ধ শুঁকিল, চাহিয়া দেখিল—কী অপূর্ব্ব তার রূপ! যেন যৌবনের সদ্যজাগ্রত রাগরক্ত হৃদয়খানি!

অন্যমনস্কভাবে ফুলটি খোঁপায় গুঁজিয়া শান্তা বাহির হইয়া ইন্দুমতীর রান্নাঘরে আসিয়া দেখা দিল। মা সেখানে বিবিধ পাত্রে বিবিধ নিরামিষ ডাল-তরকারী রাঁধিয়া নামাইতেছেন। পাশে একখানা থালায় স্তূপীকৃত লাল আলুসিদ্ধ ও নারিকেলের পুর। ইহারই প্রতি লোভাকৃষ্ট হইয়া মাণিক কিছুক্ষণ হইতে রান্নাঘরে স্থান লইয়াছে। শান্তা একখানা পিঁড়ি টানিয়া বসিল।

হঠাৎ মাণিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "অ্যাঁ! ছোড়দি, তুমি কোথায় পেলে?"

"কি রে?"

মাণিক ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিল। শান্তা চুলের মধ্য হইতে গোলাপটি খুলিয়া আনিয়া আদর করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "নাও।"

বালক মহা খুসী!

প্রিয়বাবুর লাইব্রেরী ঘরে শান্তা বই খুলিয়া বসিয়াছে—শঙ্কর ভাষ্যসমেত বৃহদারণ্যক। বড় বড় বই পড়িবার সাধ তাহার চিরকালের, কাকাবাবুর ভাণ্ডারে তাহার অভাবও নাই, শুধু বিদ্যায় বেষ্টন পায় নাই, এই যা ছিল বাধা। কলেজের পড়াশুনার চাপ যতদিন ছিল, ততদিন সময়েরও ছিল অভাব। পরীক্ষার পর হইতেই সে যত রাজ্যের বিখ্যাত বই—দেশ বিদেশের দার্শনিক গ্রন্থ পড়ায় মন দিয়াছে। সুষমা কৌতুক করিয়া বলেন, সাধু সন্ন্যাসী হবি নাকি লো? শান্তা উত্তর না দিয়া হাসে আর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ বিষয় ছিল দর্শন, ভিতর হইতেও তাহার দর্শনের দিকেই ঝোঁক। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল নীতিটি কি? শেষ পৌঁছিবে গিয়া কোথায়? কেউ কি জানে না? না জানিলে মানব-জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় কোথায়? লক্ষ্য স্থির না থাকিলে মানুষ চলে কোন্ পথ ধরিয়া? ছেলেবেলা হইতেই শান্তার অদ্ভুত মনোবৃত্তি। কেবলই সে ভাবে—ভালো কাজ করিতে হইবে শুনি, কিন্তু ভালোমন্দের মাপকাঠি কোথায়?

দিনটা বড় মেঘলা। সারারাত্রি বৃষ্টি পড়িয়া পড়িয়া ভোরের দিকে যেন শ্রান্ত হইয়া থামিয়াছে। অন্তরের গূঢ় বেদনা যত গভীরই হউক, চিরকাল তাহাকে কাঁদিয়া প্রকাশ করা যায় না। প্রচণ্ড আঘাতের উদ্দাম আবেগে জমাট অশ্রু গলিয়া পড়িয়া যখন কিছুকালের জন্য নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন চক্ষে থাকে শুধু একটা সজল ছায়া, মুখের উপরে গভীর কালিমা, তাহাই স্বচ্ছ দর্পণটির মত আপনার হৃদয়পট খুলিয়া ধরে। আজিকার আকাশখানির ছবিও ঠিক এই রকমের—থম্‌থমে, ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ।

শান্তা বাহিরে দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া দেখে, এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত একাকার, ধূসর! জীবন্ত সুন্দর মুখের উপর যে বর্ণবিভা থাকে, নিঃশেষে তাহা কে মুছিয়া লইয়াছে। কতদিন ধরিয়া তিলে তিলে উহার অন্তরে কালিমার সঞ্চার হইতেছিল, কেহ খবর তো রাখে নাই—এতদিন সন্তর্পণে সকল জ্বালা গোপন করিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু সব সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া আজ এই করুণ ক্রন্দনের পর এই ব্যথাভরা মৌন সকলকেই যেন কাঁদাইতে চায়।

চাহিয়া চাহিয়া শান্তা উন্মনা হইল।

পাশের বাড়ীগুলিতে বারান্দায় বাতাসে কাপড় শুকাইতেছে, হু হু করিয়া এক একবার বাতাসের ঠেলা লাগিয়া কোনও কোনটা ফুলিয়া উঠিতেছে নৌকার পালের মত। ছাদের কোণে দুই তিনটা কাক কিসের একখণ্ড টুকরা লইয়া ঠোকাঠুকি করিতেছে, উহাদের বিরস চীৎকারে স্তব্ধ আকাশখানা মুখরিত। দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথা দেখা যায়, লাল ফুলগুলি রাত্রির অশ্রান্ত বর্ষণে কেমন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। উহার বিচিত্র সূক্ষ্ম পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, পাতাগুলি পুলকে শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝিরঝির করিয়া এক পশলা অশ্রুপাত। দূরে,—শব্দ কিছুই শোনা যায় না, তবু শান্তা অনুভব করিল, ঐ জলঝরার মৃদুশব্দ যেন কাণে আসে। সবই কেমন ম্লান, অশ্রু-সজল, তবু কী সুন্দর! একটা লাইন মনে পড়িয়া গেল—'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।'

নাঃ আর পড়িতে ভাল লাগে না। আজকার দিনটি তাহার নিবিড় ছায়া লইয়া ঠিক যেন হৃদয়ের মধ্যে সাড়া দেয়, মস্তিষ্কের ত্রিসীমানায় যায় না। উপনিষদের গভীর তত্ত্ব বিচার করিবার মত উজ্জ্বল আলো এখন মাথার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; বাহিরের আলোক স্তিমিত,

ভিতরেও তাই। সমস্ত সত্তা দিয়া আজ যেন মানুষ শুধু অনুভব করিতেই ব্যগ্র! উপনিষদখানা সাম্‌নে খোলা পড়িয়া রহিল, অন্যমনে কয়েকখানা পাতার নীচে আঙুল ঢুকাইয়া শান্তা খোলা জানালার পথে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিপথে কোথাও বাধা নাই, কিন্তু দেখিবার বস্তুও কিছু চোখে পড়ে না। বাহিরের ছবি যেখানে মনের মধ্যে প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে, সমস্ত দৃষ্টি আজ সেইখানে।

পিছনে দুয়ারের কাছে সত্যকাম আসিযা দাঁড়াইল। শান্তা ফিরিয়া তাকাইল না। সত্য কতকটা অতিষ্ঠ, কতকটা আহত হইল,—ভাবিল, ফিরিয়া যাই।

তবু অবাধ্য চরণের গতি গেল সম্মুখের দিকে।

সামনের আলমারীগুলির কাচের কবাটে অস্পষ্ট আলো খেলা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার বুকে একটা গভীর ছায়াপাত অনুভব করিয়া শান্তার স্বপ্ন টুটিল। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখে—সত্যকাম।

সত্য বলিয়া উঠিল, "বাপ্ রে বাপ্! এতক্ষণে তন্দ্রা ভাঙ্‌ল? আমি পাঁচ মিনিট ধরে এখানে দাঁড়িয়ে?"

"ঘরে ঢুকে পড়লেন না কেন?"

"আপনার ধ্যানভঙ্গ করব অত বড় দুঃসাহস আমার নেই!"

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া শান্তা বলিল, "সত্যি, আকাশটা কি সুন্দর লাগ্‌চে, দেখচেন?"

"সুন্দর! বলেন কি? বৃষ্টিতে বাদলে পচে মরলাম। এখন রোদ উঠলেই বাঁচি!"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি দেখ্‌চি আশ্চর্য্য লোক। আচ্ছা, আপনি মেঘদূত পড়েচেন?"

"সংস্কৃতসাহিত্যে দন্তস্ফুট করবার শক্তি বা ধৈর্য্য কোনটাই আমার নেই।"

"রবিঠাকুরের 'কেকাধ্বনি' ?"

"পড়েছিলাম—এ্যাপ্রিশিয়েট কর্ত্তে বেশী পারি নি কিন্তু।"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "ও আপনি পারবেন না—আমি বুঝতে পেরেচি।"

সত্যকাম বলিল, "তা আপনার মত অত উঁচুদরের কবিত্ব আমার নেই, স্বীকার করি।"

শান্তা উত্তর না দিয়া হাসিল।

কথা বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া তারপর কতক্ষণ চুপ।—কিন্তু বড় অস্বস্তিকর! খানিক পরে নীরবতা ভাঙিয়া সত্য জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, আপনি এত গম্ভীর কেন?"

"গম্ভীর? কৈ?"

সত্য বলিল, "এই তিন চার দিন আপনার কাছে আসি নি কেন জানেন?"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ভয় করে বলে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শান্তা সবিস্ময়ে বলিল, "ভয়!"

সত্যকাম চোখ নীচু করিয়া শান্তার মুখের উপরে দৃষ্টি নামাইয়া আনিয়া সহাস্যে বলিল, "সত্যি।"

শান্তা বলিল, "ভয় করবার মত আমার মধ্যে কি দেখলেন?"

"পরিষ্কার বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না, কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে—কিছু একটা আছেই যাতে মানুষকে একেবারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না।"

চেয়ারের একদিকে একটু হেলিয়া বসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখে শান্তা বলিল, "তাহলে আমার দুর্ভাগ্য! বাস্তবিক, ভীষণ হওয়া জিনিসটাকে আমি বড্ড অপছন্দ করি।"

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া সত্য বলিল, "আমি আপনার কাছে এলে আপনি রাগ করেন, না ?" জিজ্ঞাসুনেত্রে সে শান্তার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

শান্তা বলিল, "আমাকে রাগ কর্তে দেখেছেন কখনো ?"

"দেখবার দরকার করে না—বোঝা যায়।"

"তাহ'লে আমার তো বলবার কিছুই নেই। যা আপনি অলরেডি বুঝে রেখেছেন, তাকে অপ্রমাণ করবার আমার সাধ্য কোথায় ?"

সত্যকাম বলিল, "সত্যি কথাকে অপ্রমাণ করবার সাধ্য কারুরই থাকে না।"

কথা কাটাকাটি করিয়া কোনই লাভ নাই বুঝিয়া শান্তা চুপ করিল। টেবিলের উপর গতদিনের খবরের কাগজখানা পড়িয়া ছিল, অপ্রয়োজনেও সেখানা সে খুলিয়া ধরিল।

সত্য একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আজকের স্টেটসম্যান ?'

"না।"

এ-পাতা ও-পাতা উল্টাইয়া শান্তা হঠাৎ বলিল, 'আজকে কলেজ নেই বুঝি ?"

"হ্যা—আছে তো।"

"কটায় ক্লাস ?"

"ঢের দেরী—একটায়।"

শান্তা সামনের দেয়ালে ঝুলানো বড় ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইল।

চট করিয়া সত্যকাম টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজ তরল কণ্ঠের পরিবর্ত্তে কেমন একপ্রকার অস্বাভাবিক স্বরে বলিল, "থাক, আর আসব না,—যাই।"

শান্তা চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, বুঝিতে বাকী রহিল না। বাস্তবিক ভারি অন্যায় হইয়া গেছে। সে ভয়ানকভাবে অপ্রস্তুত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওকি হল? আমি—"

কথাটা পুরাপুরি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সত্যকাম বলিল, "দরকার কি? মিছেমিছি এসে আপনাকে বিরক্ত করব কেন?"

"বিরক্ত আমি হইনা—সত্যি—"

অবিশ্বাসের সুরে একটু হাসিয়া সত্য বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি।"

"বিশ্বাস করচেন না?—সত্যিই।"

"বুঝেচি।—চললাম।"

শান্তার একটু রাগ হইল। ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা যান। আমার ক্ষতি কি?"

সত্যকাম দরজার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "না, ক্ষতি আপনার কিছু নেই, ক্ষতি আমারই।"

সে চলিয়া গেল। শান্তা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্যকাম কি সত্যসত্যই ব্যথা পাইয়াছে, না শুধু একটা বাহিরে দেখানো অভিমান? তাহার মুখের উপর যে একটু ম্লানিমা শান্তা দেখিতে পাইল, তাহা কি বাস্তব না বাহিরের অন্ধকারের ছায়া, না নিজেরই আজিকার ভাবাক্রান্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি? কিন্তু এমনই বা কি সাংঘাতিক কারণ ঘটিয়াছে, যাহাতে সত্যর এত অভিমান? শান্তা কখনও কাহাকেও কাছে আসিতে, গল্প করিতে বাধা দেয় নাই। সকলকে আত্মীয় করিয়া লওয়াই তাহার স্বভাব যে! যতগুলি মানুষকে আজ পর্যন্ত তাহার চিনিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, সকলকেই সে অল্পবিস্তর ভালোবাসে, সত্যকামকেও ভালো না বাসিবার কোনও কারণ তো ঘটে নাই। তবু সে খুশী হয় না

কেন ? আশ্চর্য্য তাব প্রকৃতি ! এত চঞ্চল, হাস্য-পবিহাসপ্রিয়, এমন বালক-সুলভ সবলতা, অথচ মাঝে মাঝে অকস্মাৎ গাম্ভীর্য্য বাহিব হইয়া আসে কোথা হইতে ? হৃদযটা ভাবি কোমল, অল্পেতেই বুঝি দাগ পড়ে। বুঝিলে শান্তা আবও সন্তর্পণে, আবও সস্নেহে তাহাব সহিত ব্যবহাব করিত।

নিঃশ্বাস ফেলিযা শান্তা বইখানি খুলিযা বসিল।

১৭

সপ্তাহখানেক পরে ললিতা একদিন আসিয়া উপস্থিত। বহুদিন তার আসা হয় নাই। আসি আসি করিয়া এ বাধা সে বাধা—সংসারী মানুষের বাধা আর ঘোচেই না। তবু তো রক্ষা ছেলে-মেয়ের উপদ্রব এ পর্য্যন্ত ললিতার স্কন্ধে আসিয়া চাপে নাই। আজ নিতান্তই আসিবে বলিয়া জোর করিয়া সময় করিয়া লইয়াছে, সুষমা ও ইন্দুমতীর সঙ্গে সামান্য একটু কথার প্রয়োজনও ছিল।

শান্তার পরীক্ষার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ইন্দুমতী তাহার বিবাহের জন্য একটু আধটু সন্ধান করিতেছিলেন। এবারে পড়া সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এখন রীতিমতই চেষ্টা করা প্রয়োজন। হিন্দুমেয়ের পক্ষে যতদূর বিদ্যালাভ হওয়া সম্ভব, তাহা শান্তাকে দেওয়া হইয়াছে, এবারে নারীজীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্যভার বরণ করিয়া লওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য, এই ইন্দুমতীর মত। প্রিয়লাল বাবুর মতে, বিদ্যানুশীলন এখানেই থামিয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে বাকী যেটুকু আছে, তাহা বিবাহিত জীবনের অবসরে অবসরেই চলিতে পারে। সুতরাং শান্তার বিবাহ এখন সর্ব্বানুমোদিত।

ললিতা আজকাল নিজে গৃহিণী; সুতরাং বিবাহাদি গুরুবিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত আলোচনা পরামর্শ করিতে কিছু বাধে না। তার উপর, শান্তাকে সে বড় ভালবাসে, তাহার জন্য একটি নিখুঁত পাত্র স্থির করিয়া দিবার আগ্রহও আছে অনেকখানি। এই সম্বন্ধেই একটি প্রস্তাব জানাইবার জন্য সে আসিয়াছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ললিতা ও শান্তা জাপানী ছবি-আঁকা মাদুর বিছাইয়া মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছিল, খাটের উপরে শুইতে আর ভাল

লাগে না ভাবি গরম। অনেকদিন এমন নিশ্চিন্ত আরামে এমন নিরালা বিশ্রম্ভসুখ দুইবোনের উপভোগে আসে নাই। ভারি ভাল লাগে। মনে মনে পড়িয়া যায় গত দিবসের ছোটখাট কত কাহিনী।

"ছেলেবেলাটা কি সুন্দরই ছিল দিদি।"

"সত্যি, কি সুখেই গেছে, না?"

শান্তার মনে পড়ে দেশ দেশান্তরের কত অভিনব অভিজ্ঞতা, কত কত রঙীন কল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে কত অসম্ভব স্বর্গসৃষ্টি। সে অবস্থার ও আবেষ্টনের কত রূপান্তর ঘটিয়াছে, তবু সেই কল্পনার কুহক ও স্বর্গের মাধুরী আজও চক্ষের সম্মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাহাকে আজ যেন আরও নিবিড়ভাবে, আরও জাগ্রতভাবে লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পথের সাথী কে হইবে? ছিল শুধু একমাত্র দিদি—সেও যেন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

"এমনি দুপুরবেলা কতদিন আমরা সেই জামগাছের ছায়ায় বসে, সেই ছাদের চিলে-কোঠায় শুয়ে শুয়ে মানুষের দুঃখদৈন্য, সমাজের সংস্কার নিয়ে কত কল্পনাই করতাম—ভুলে গেছিস্ দিদি?"

ললিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলল, "বলিস্ নে আর ভাই। কিছুই যে তার সফল কর্ত্তে পারব না, একথা মনে কর্ত্তেও পারিনি।"

"সত্যি? পারব না?"

ললিতা আফশোষ করিয়া বলে, "সম্ভাবনা তো কই কিছুই দেখচি নে। সংসারের পাকে জড়িয়ে পড়লে আর বোধ হয় বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না মেয়েমানুষের পক্ষে।"

শান্তা নিঃশ্বাস ফেলিল।

পারিবে না বলিয়া ললিতার মনে বাস্তবিক কোনও ক্ষোভ আছে কি? কই, মনে তো হয় না। তাহা হইলে শান্তা হয়ত একটু সুখী হইত,

হয়ত আবার নিজের প্রাণের প্রেরণা দিয়া ললিতাকে টানিয়া লইয়া যাত্রা সুরু করিতে পারিত। কিন্তু আগেকার সেই আদর্শের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ আজ তার কই? থাকিত যদি, তবে ললিতার কথাগুলি এমন নির্ব্বিকার সুরে বাহির হইতে পারিত না নিশ্চয়ই। যে তেজস্বী ললিতা আপনার সম্মুখে কোনও বাধাকে নীরবে কখনও সহ্য করিতে চাহে নাই, বিদ্রোহের ফণা তুলিয়া দাঁড়ানোই যাহার স্বভাব আদর্শ সিদ্ধির পথে সত্য সত্যই বিঘ্ন অনুভব করিলে তাহার সুরে ও ভঙ্গিতে কি একটা প্রচণ্ড ক্রোধ, একটা গভীর বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিত না? না না,—শান্তা বুঝিল, ললিতার লক্ষ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর পড়া তো শেষ হয়ে গেল, এর পরে কি করবি ঠিক করেছিস্ ভাই?"

একটু ভাবিয়া শান্তা উত্তর দেয়, "কি করব? কি জানি দিদি, একেবারেই বুঝতে পারচি না। যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই কত কাজ করবার পড়ে রয়েছে। কিন্তু নিজের মনের সত্যিকার ঝোঁক যে কোন্ দিকে, ঠিক ধর্ত্তে পারি না। ইচ্ছে করে, এক সঙ্গে সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি; তা তো হয় না! বিরাট্ একটা কিছু গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে ভেতর থেকে ধাক্কা দেয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোনও একটা লক্ষ্যে যুক্ত না হতে পারার দরুণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেঘোরে নষ্ট হয়। কি করব বুঝি না, কেউ পথ দেখিয়েও দেয় না—কাজেই নিজের মধ্যে দিশেহারা হয়ে মরি। একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় শীগ্গির শীগ্গির না পেলে আমার আর ভালো লাগ্চে না ভাই।"

সুষমা ঘরে ঢুকিলেন। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেই এতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে—বেজায় দুরন্ত। অথচ ঘুম না পাড়াইলে সারা দুপুর রোদের মধ্যে কালু ও রেণুর সঙ্গে ছাদময় হুড়াহুড়ি করিবে। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে

শান্তার শেষ কথা কয়টা সুষমার কানে গেল। পরিহাস করিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা ওকে জুটিয়ে দে না ললিতা! অবিশ্যি, যোগ্যং যোগ্যেন হয় যেন!"

শান্তা হাসিল।

সুষমা বলিলেন, "কি রে? হাসলি যে!"

"তোমার কথা শুনে।"

"হাস্‌বার মত কি কথা বল্লাম আমি?" অর্দ্ধেক সকৌতুকে, অর্দ্ধেক গুরুগম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আর চিবটাকাল অম্‌নি মুখে হেসে উড়িয়ে দিলেই চল্ল আর কি? আসলে যে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে আব বুঝতে পারিনে বুঝি?"

আবার শান্তা হাসিল। চকিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুষমা দেখিতে পাইলেন, ঠোঁটের কোণে কি রকম অবজ্ঞার সহাস্য ব্যঙ্গ।

রাত্রিতে আহারান্তে সুষমা যখন আপনার ঘরে আসিলেন, প্রিয়লালবাবু শুইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছেন। সুইচে হাত দিয়া সুষমা বলিলেন, "লাইটটা নিবিয়ে দিই?"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "না, না, আব একটুখানি বাকী—এই পাঁচ ছ' পাতা—"

বিছানার উপরে বসিয়া পড়িয়া সুষমা বলিলেন, "তাহলে তুমি নিবিয়ে দিও। আমি ঘুমোলাম।"

"আচ্ছা, সে হবে'খন।"

খানিক পরে বই বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিয়া প্রিয়লাল বলিলেন, "নির্ম্মল একটা প্রস্তাব এনেছিল—ললিতা তোমাকে বলেছে?"

"শান্তার বিয়ের তো?"

"হ্যাঁ।"

"শুনেছি।"

"তোমাদের পছন্দ হয়?"

"হ্যাঁ, বেশ তো!"

"আমারও ভালই মনে হচ্ছে।"

সুষমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু শোনো একটা কথা। —শান্তা বিয়ে কর্ত্তে রাজি হবে তো?"

প্রিয়লাল বলিলেন, "কি রকম?"

"আমি তো একরকম ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখ্‌চি—একটু যেন অস্বাভাবিক রকমের, না? আজকাল বিশেষভাবেই এদিকে অসম্মতি দেখচি যেন। বোধ হয় বিযে করবেই না।"

প্রিয়বাবু এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত হইয়া রহিলেন; তাহার পরেই কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, "করব না বল্লেই হবে? ওসব কথায কান দিও না যেন তোমরা। শান্তা কি বলেছে, শুনি?" মেয়েদের কোনও গুরুতর বিষয়ে কোনও যে স্বাধীন মত থাকিতে পারে,—এবং বিশেষতঃ তাঁহার ইচ্ছা বা ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহার পরিবারস্থ কেহ যে স্বীয় অভিমত দাঁড় করাইতে পাবে, এ তাঁহার কাছে একান্ত অসম্ভব, অত্যন্ত ধৃষ্টতা!

সুষমা স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইলেন। প্রিযলালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলিলে ফলোদয় যে তাহাতে কতটুকু হয়, তাঁহাব ভালই জানা ছিল। শান্তার দোষ কাটাইবার ব্যগ্রতায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না সে নিজে কিছু বলে নি। আমার মনে হয।"

"ওসব বাজে।" বলিয়া প্রিয়লালবাবু গম্ভীরভাবে পাশ ফিরিযা শুইবার উপক্রম করিলেন।

ললিতার কথায় শান্তা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের সম্বন্ধে একথা কেহ কোনদিন তুলিবে, এজন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে যেন এখনও অন্তরে বাহিরে কুমারী।

ললিতা জিজ্ঞাসা করে, বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি আছে কি না। উত্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া না পাইয়া শান্তা পাল্টা প্রশ্ন করে, "না কর্লে তোদের আপত্তি আছে?"

"আমার আপত্তি কিছু নেই ভাই। তবে মা, কাকাবাবু এঁরা সবাই কর্লে সুখী হন যখন—"

"না কর্লে দুঃখ কি আছে, দিদি, আমি তো দেখ্‌তে পাইনে!"

ললিতা ভাবিয়া বলিল, "বিয়ে কর্লে তুই সুখী হবি, এই তাঁদের বিশ্বাস। সবাই তাই হয়।"

শান্তা মনে মনে অস্বীকার করিল। তাহার তো বিশ্বাস, বিবাহ করিলেই সে অসুখী হইবে, উহা তাহার শক্তিপথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বিবাহের মধ্যে এমন প্রলোভন কি আছে যাহার আকর্ষণে নিজের স্বাধীন মনুষ্যত্বকে সে বিসর্জ্জন দিতে পারে? কিছুই না। সে উত্তর দিল, "বিয়ে করে আমার আর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সব যদি লোপ পায়, আমি কি তাহলে সুখী হবো, তুইও মনে করিস্ সত্যি?"

"আর সব লোপ পাবে কেন ভাই? কি যে বলিস্!"

শান্তা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জবাব দিতে পারিল না। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে, বিবাহ, স্বামীর প্রতি অত্যদ্ভুত আসক্তি, সন্তানের সৃষ্টি, বাৎসল্য, দায়িত্ব—একটির পর একটি শৃঙ্খল আসিয়া একত্র জড়াইয়া নারীর

মানসিক ও আত্মিক বৃত্তির অনুশীলনে পদে পদে অন্তরায় ঘটায়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া এতকথা সে দিদিকে কোনমতেই বলিতে পারিবে না।

ললিতা বলিল, "আর তা ছাড়া ভাই, লোপ পাওয়া তুই যাকে মনে কর্চ্ছিস্, সেটাও সত্যিকার লোপ পাওয়া নয়। যে কাজটি তুই নিজে হাতে না কর্ত্তে পারিস্, সেটা যদি তোর ছেলেমেয়েরা সম্পন্ন করে, তাহলে তো তোরই সার্থকতা—ডিরেক্টলি না হলেও ইন্‌ডিরেক্টলি। জানিস্ তো—দি হ্যাণ্ড্ হ্যাট্ রক্স দি ক্রেড্‌ল্ রুল্‌স্ দি ওয়ার্লড্ (The hand that rocks the cradle rules the world) ?"

এই কথাটায় শান্তার হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। চির-কালের আওড়ানো যত বাজে বুলি! দৃপ্তভাবে কি একটা প্রত্যুত্তর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া পড়িতেই তাহাকে দমাইয়া বলিল, "ডিরেক্টলিই সার্থকতা অর্জ্জন কর্ত্তে পারি যদি, তবে ইন্‌ডিরেক্ট সার্থকতার আশায় হাত পা গুটিয়ে প্রতীক্ষায় বসে থাকি কেন ?"

ললিতা চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল, "সে তো সত্যি। কিন্তু আমি বলি কি জানিস্—মা হওয়ারও তো মস্ত বড় সার্থকতা আছে, এ কর্ত্তব্য-ভার তো মেয়েদের নিতে হবে। এই বড় দায়িত্বটা মুখ্যত সুসম্পন্ন কর্ত্তে গিয়ে অন্য দুচারটে কর্ত্তব্য যদি গৌণভাবে করা যায়, তাতে এমনই বা কি ক্ষতি ?"

"মা হওয়ার দায়িত্ব এতই কি মহৎ ? আমি কিন্তু বলি, এর কোনও বিশেষ মূল্যই নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া ললিতা বলিয়া উঠিল, "মূল্য নেই !! মাতৃত্ব লোপ পেলে সৃষ্টিসুদ্ধ লোপ পাবে যে !"

"এই সৃষ্টিটাকে যে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, এমন বিধান কে দিল ভাই ?"

ললিতা একেবারে অবাক্ হইল। "সৃষ্টির কোনও মানে নেই, সংসার

অসার—এ সমস্ত সেকেলে সংস্কার তুই জোটালি কোত্থেকে বল্ তো? মডার্ণ স্পিরিট্ হচ্ছে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

শান্তা বলিল, "মর্ত্তে কি আমি চাই? কিন্তু বেঁচে থাকারও খুব বেশী দরকার দেখতে পাইনে। নেহাৎ যখন একবার জন্মে পড়েছি, তখন জন্মটাকে ভালো করে সার্থক করবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে বৈকি—অন্ততঃ জীবনটাকে একবার স্পষ্ট করে জান্তে চাই। কিন্তু যারা এখনো জগতে আসে নি, তাদের টেনে আনার কি দরকার?" কথা বলিতে একবার আরম্ভ করিয়া শান্তার সঙ্কোচ কাটিয়া আসিল। বাহিরের দিকে লক্ষ্য-হীন দৃষ্টি মেলিয়া নির্ব্বিকার সুরে বলিয়া চলিল, "সত্যি কথা কি জানিস্? মানুষ নিজেকে সংযত কর্ত্তে পারে না বলেই বিয়ে করে, নিজের কামনার তাড়নায় নূতন জীবের জন্ম দেয়; অথচ নিজেদের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা পায়, কাজেই মাতৃত্বধর্ম্ম, সুমহৎ কর্ত্তব্য ইত্যাদি বড় বড় কথার অবতারণা করে তাকে ঢাকে। আমি অবশ্যি বল্‌ছি না, বিয়ে করাটা অন্যায়। মানুষ তার দেহের সহজ প্রকৃতিবশে এটা খুবই কর্ত্তে পারে। কিন্তু আত্মিক মানুষ যদি তার আত্মার উন্নতির জন্যে এই দৈহিক প্রলো-ভনকে জয় কর্ত্তে পারে অথবা চেষ্টা করে, সেটা হয় আরো গৌরবের। 'সুন্দর ভুবনে' বেঁচে থাকাটা খুব সুখের কথা, কিন্তু যদ্দিন ভুবনকে সুন্দর করে তোলা না যায়, তদ্দিন এর অধিবাসী বাড়িয়ে লাভ কি বল্? 'মানুষের মাঝে' বাঁচা বেশ ভালো, কিন্তু আগে মানুষের মত মানুষ তৈরী কর্ত্তে হবে তো? মনুষ্যত্ব বস্তুটি কি, তাই জানলাম না, নিজেই এখনও মানুষ হতে পারিনি, অথচ ভবিষ্যৎ মানুষ সৃষ্টি করবার এবং গড়ে তুলবার ভার নেব আমি!!"

এ যে একেবারে রীতিমত সার্মন্!—ললিতা কি উত্তর করিবে ভাবিয়া

পাইল না। ব্যবহারিক জীবনের অতি সামান্য ব্যাপারের মধ্যে যদি এই সব দার্শনিক প্রসঙ্গের আবির্ভাব হয়, তবে তো বড় বিপদের কথা!

ললিতা বলিল, "বুঝলাম তো সব! কিন্তু দ্যাখ্ ভাই, এর জন্যে যদি গুরুজনরা অসন্তুষ্ট হন সেটা কি ভালো হবে?"

শান্তা বলিল, "না রে—কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না।"

ললিতা প্রিয়লালবাবুর অভিপ্রায় শুনিয়াছে, সেই জন্যই সে এত ব্যস্ত ও শঙ্কিত। সে বলিল, "কি জানি ভাই, কাকাবাবু হয়ত বিয়ে দিতে চান্—"

"চাইলে কি হবে বল্? আমি যে—"

"কিন্তু কাকাবাবুকে জানিস্ তো! তিনি যা মনে করেন তাকে টলানো কি আমাদের সাধ্যি? সেদিন তিনি কাকীমাকে নাকি বল্ছিলেন—"

শান্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্ছিলেন?" প্রিয়লালের উক্তিগুলির উপরে যথাসম্ভব সুরের মাধুর্য্য বুলাইয়া ললিতা বিবৃত করিল।

শান্তার মন হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। পরিবারের প্রতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই প্রিয়বাবুর মতামত এমন অত্যধিক প্রাধান্যলাভ করিয়া আসিতেছে যে, তাহার চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকে। বয়সের ও অভিজ্ঞতার পরিমাণে তাহার মায়ের স্থান অনেক উচ্চে, কিন্তু তাঁহার মতামত সকল সময় তো কার্য্যকরী হয় না। সহধর্ম্মিণী হিসাবে সুষমার অধিকার প্রিয়লালের সমান হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি কখনও প্রিয়বাবুর বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। এমন হয় কেন? কাকাবাবুর চরিত্রে অনেক প্রশংসনীয় গুণ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিগত এই প্রভুত্ব-প্রিয়তা শান্তাকে বরাবর পীড়া দিয়া আসিতেছে। পুরুষের এই জাতিগত অহঙ্কার সে কোনদিন সহ্য করিতে পারে না। আজ প্রিয়বাবুর এই

প্রভুত্ব তাহার নিকট একান্ত গর্হিত মনে হইল। নিতান্ত যদি তিনি গুরুজন না হইতেন, তাহা হইলে সে ইহাকে বলিত—স্পর্দ্ধা! মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ়তম ঘটনা যে বিবাহ, সে সম্বন্ধেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতে আসেন কেন? শান্তাব বিবাহের প্রযোজন অপ্রয়োজন বাহিরের ইঙ্গিতে তো কখনও চালিত হইতে পারে না—ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার শান্তার নিভৃততম অন্তরে। তাহার তো স্পষ্ট মনে আছে, গুরুজনদের উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও কাকাবাবু বহু বয়স অবধি অবিবাহিত ছিলেন। সে অধিকার তিনি পাইয়াছিলেন কোথা হইতে? পুরুষের অধিকার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত—আর মেয়ে বলিয়াই কি নারীজীবনের একান্ত নিগূঢ়ক্ষেত্রেও সে অপরের আদেশানুবর্ত্তী? সকলের সকল আদেশ ও অনুরোধ সে নির্ব্বিরোধ হাসিমুখে পালন কবে বলিয়া প্রিয়বাবুর কি বিশ্বাস হইয়াছে, সে বাধা দিতে জানেনই না? সে কি দুর্ব্বল? শান্তা ভাবিতে ভাবিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবার সে কোনও মতেই নিরীহভাবে অপ্রতিরোধ হইয়া থাকিবে না। যদি বিবাহ করিবার পক্ষে তাহার আর কোনও বাধা না-ও থাকে, তবু একমাত্র কাকাবাবুর এই প্রভুত্বকে প্রতিহত করিবার জন্যই সে অবিবাহিত থাকিবে। এমন অদম্য প্রলোভন নিশ্চয়ই বিবাহের মধ্যে নাই, যাহাকে তাহার ইচ্ছাশক্তি পরাভূত করিতে না পারে। প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার যে অধিকার ও শক্তি পুরুষের আছে, নারীরও তাহা আছেই। না যদি থাকে, তবে লজ্জার কথা!

শান্তা গম্ভীর প্রশান্ত মুখে বলিল, "আমার যা বল্‌বার, তা তো বল্লাম ভাই!"

ললিতা বলিল, "কিন্তু—কাকাবাবু যদি জোর করেন?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া শান্তা বলিল, "দেখা যাক্।"

সত্যকাম সেদিন যে চলিয়া গিয়াছে, আর এ কয়দিন আসে নাই। শান্তা মনে মনে একটু দুঃখ পায়, অকারণের অভিমান যে এতদিন স্থায়ী হইতে পারে, তাহা সে ভাবে নাই। সত্যকাম যদি সেদিন অমন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলি না বলিয়া এমনিই সহজে তাহার কাছে আসা-যাওয়া বন্ধ করিত, তবে শান্তার বিশেষ ক্ষতি ছিল না। ব্যবহারের তারতম্যটুকু চোখেও পড়িত না হয়ত। কিন্তু এখন কোন মতেই ভুলিয়া থাকার জো নাই, কথার কাঁটা কেবলই মনের মধ্যে খোঁচা দিয়া মনটাকে সজাগ করিয়া রাখিতে চায়।

কয়দিন ধরিয়াই সত্যকামের বড় ইচ্ছা হইতেছিল, আবার রাগ ভাঙিয়া ফিরিয়া আসে। শান্তা সাধিয়া তাহার মান ভাঙাইতে আসিবে না, ইহা যখন জানা কথাই, তখন দূরে দূরে থাকিয়া লোকসান তাহারই। কিন্তু কেমন করিয়া ফিরিয়া আসা যায়?

অসহ্য গরম! দুপুরবেলা শান্তার ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। ঘরের কোণে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া জানালার কাছে গিয়া চোখে মুখে জল ছিটাইতেছে, এমন সময় সত্যকাম হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দেখুন দিকি, কাকে নিয়ে এসেছি!"

সঙ্গে সঙ্গে রোগাধরণের শ্যামবর্ণ একটি ছেলে দুয়ারের সম্মুখে দেখা দিল। সোৎসুখে ফিরিয়া শান্তা বিস্ময়ে পুলকে বলিয়া উঠিল, "ওমা! বারীন—তুমি?"

সসঙ্কোচে লাজুকভাবে একটু হাসিয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো আছেন?"

হাতের গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া শান্তা ব্যস্তসমস্তভাবে খাটের উপরে মাদুরখানা সুবিন্যস্ত করিয়া বলিল, "বোসো।"

বারীন বলিল, "অনেকদিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা। আর যে দেখা হবে এ তো ভাবতেই পারিনি!"

"সত্যি, ভারি ভালো লাগ্‌ছে।"

বারীন একটু হাসিল।

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আজ হঠাৎ এলে কোত্থেকে?"

"মাস দেড়েক ধরে কল্‌কাতাতেই আছি,—এম-এ পড়ছি কিনা!"

"ও-হো, তাইত! তুমিও তো বি-এ পাশ কল্লে এবার?—এতদিন এখানে আছ, আগে দেখা কর নি কেন বল তো?"

"আপনারা এখানে আছেন আমি জান্তামই না যে! আজকে হঠাৎ সত্যবাবুর কাছ থেকে একটু আগে শুনলাম।"

সত্যকাম বলিল, "দেখুন তো, আমি আপনার কি রকম উপকারটা করলাম! উনি তো আপনার সন্ধান জেনেও দেখা না করেই পালাচ্ছিলেন, আমি ধরে নিয়ে এলাম বলে। এজন্য আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কিন্তু!"

বারীন চিরকালের লাজুক ছেলে, কাহারও সঙ্গে মিশিতে একেবারেই অপটু, তাহা শান্তা জানে। তাহার পক্ষে এমনভাবে দেখা না করিয়া পলাইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সে বারীনের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "যথেষ্ট ধন্যবাদ!"

গল্পগুজব অনেকক্ষণ চলিল। যে পুরাতন পরিচয় প্রায় ভুলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, আজ এমন আকস্মিকভাবে তাহার পুনরভ্যুদয়ে শান্তার কেমন যে পুলক লাগিতেছে, সে নিজেই অনেকটা বুঝিতে পারিল না। সত্যকাম দেখিল, তাহার চোখে মুখে একটা সস্নেহ জ্যোতি

ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কতটা সত্য, কতটা তাহার কল্পনা, বলা অবশ্য কঠিন।

বারীন বলিল, "ললিতাদিকে দেখছি না তো?"

"কাল এলেই কিন্তু ঠিক দেখা হ'ত! আজকে ও ওর বাড়ী চলে গেছে।"

বারীন নূতন আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ওমা, ললিতাদির বিয়ে হয়ে গেছে?"

"কোন্ জন্মে!"

দীর্ঘদিনের অবকাশে কত কিছু নূতনত্ব, কত পরিবর্ত্তনই হয়ত এই পরিবারে দেখা দিয়াছে, ভাবিয়া বারীন্দ্রের কেমন অদ্ভুত ঠেকিল।

ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করিয়া, সুষমার সাথে পরিচিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বারীন বলিল, "আমি চল্লাম।—আপনিও বেরুবেন নাকি সত্যবাবু?"

সত্যকাম বলিল, "নাঃ!—চলুন আপনাকে নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বারীন্দ্র বিদায় লইতেই সত্যকাম আবার সোজা উপরে চলিয়া আসিল। বারীন্দ্র তাহার সতীর্থ—এই পর্য্যন্তই তাহার সঙ্গে পরিচয়। প্রিয়বাবুদের পরিবারের সঙ্গে তাহার কি যে সম্পর্ক, তাহা জানে না। কিন্তু আজ দেখিয়া মনে হইতেছে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বিশেষ কিছুই নয়; তথাপি সত্যকামের কেমন কৌতূহল হইল, কেমন যেন মনের মধ্যে বিষয়টা ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। ঘরে আসিয়াই তাহার চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিমায় টেবিলের কিনারা ঘেঁসিয়া বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়া সে গল্প জুড়িল।

শান্তা সহাস্যমুখে শুনিয়া চলে; পাছে আবার অভিমানের পুনরাভিনয় সুরু হয়, সুতরাং প্রশ্রয় একটু বেশী করিয়াই দেওয়া ভাল।

সত্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বারীনবাবু আপনার কে হন ?"

"কেউ না, এমনি আলাপ।"

"অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বুঝি ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "তাও কিন্তু নয়। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই—তখন আমরা রাজসাহীতে—সেবার মফঃস্বল থেকে যত ছেলে সহরে এলো পরীক্ষা দিতে, তাব দু'চাবজন ছিল আমাদের বাড়ীতে। সেই সূত্রে বারীনেব সঙ্গে আলাপ। তারপরে ফল বেরোবার পরে আর একবার দুতিনদিনের জন্যে এসে আমাদের বাড়ীতে ছিল। তারপর থেকে আর এত বছব দেখা হয় নি।"

"এতেই এত আত্মীযতা !!"

শান্তা একটু হাসিযা বলিল, "খুব আত্মীযতা দেখলেন নাকি ? সত্যি, একটু আশ্চর্য্য হবার কথা। অথচ আমি ওর বাড়ীর কারো নাম পর্য্যন্ত জানি নে, বাড়ীঘর বংশপরিচয় কিছুই না—মা বুঝি কিছু কিছু জানেন—কিন্তু হলে কি হবে ? ওকে বড্ড আপনাব বলে মনে হয। কত ছেলে এসে তো ছিল আমাদের ওখানে, আব কাবো সা'থে পবিচযও হযনি কিন্তু আমার ! এক একটি লোকের মধ্যে যেন বিশেষত্ব থাকে। না ?"

সত্যকাম পকেট হইতে ফাউণ্টেন্ পেন্‌টা নামাইয়া বারবার খুলিয়া বারবার বন্ধ করিতেছিল। মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া ঠাট্টার সুরে বলিল, "বারীনবাবু দেখ্‌চি গত জন্মে অনেক পুণ্যি সঞ্চয় করেছিলেন !"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কেন ?"

"দেখ্‌চি তো তাই !"

সত্যর ক্ষণেকের চাহনির মধ্যে কি একটু অভিনব আভাস অনুভব করিয়া শান্তা মনে মনে বিব্রত হইল।

ঝি আসিয়া খবর দিল, দিদিমণির সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন। শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কে ভদ্রলোক ?"

"ঐ যে লম্বাপানা, জোয়ান মত দেখ্‌তে, ঐ যে মাঝে মাঝে আসেন !"

"শান্তা বুঝিল, অপরেশবাবু। তিনি আজকাল প্রায়ই ছোটখাট কারণবশতঃ আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন, গত দুই সপ্তাহে বোধ হয় তিনবার আসিয়াছেন। অতসী নাই, কাজেই অপরেশের উপরেই এখন সকল কাজের ভার। সুতরাং শান্তার কাছে প্রয়োজন কিছু কিছু বাড়িয়াছে বৈকি ! কিন্তু শান্তার সব সময় বেশী ভাল লাগে না যেন। তিনি মাঝে মাঝে অনর্থক বাজে কথা বলেন। একে তো শক্তিমন্দিরের কাজের মধ্যে প্রাণমন দিয়া খাটিবার মত কিছুই সে পায় না, তাহাতে আবার সভ্যদের অনেকের সঙ্গেই মতেও মেলে কম। কাজেই শান্তা চায় নিজেকে যথাসম্ভব কম সংশ্রবে রাখিতে, অথচ অপরেশবাবু প্রায় কোনও ব্যাপারেই তাহার পরামর্শ না লইয়া কিছু করেনই না। ইহার চেয়ে অল্প সম্মান ও সমাদর দেখাইলেই তাহার ভাল লাগিত।

শান্তা বলিল, "যাচ্ছি।"

সত্যকাম অগত্যা উঠিল।

শান্তা নীচে গিয়া ঘরে ঢুকিতেই অপরেশবাব সহাস্য মুখে সাদর নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, "আবার আপনাকে একটু বিরক্ত কর্ত্তে এসেচি।"

শান্তা নির্ব্বিকার সুরে বলিল, "কি বলুন ?"

একখানা মোটা বাঁধানো খাতার কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া অপরেশ বলিলেন, "এই খানটাতে আপনার একটা সিগ্‌নেচার চাই। আর দেখুন, কতগুলো করেস্‌পণ্ডেন্‌স্‌ এনেচি, আপনি একবার দেখবেন।"

নিজের ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌টি শান্তার হাতে আগাইয়া দিয়া অপরেশ চিঠির উদ্দেশ্যে বুক খোলা সাহেবী কোটটির পকেটে হাত ঢুকাইলেন।

স্বাক্ষর করিতে করিতে শান্তা বলিল, "চিঠিগুলোর জবাব আপনিই দিয়ে দিলে হ'ত না?"

"হ্যাঁ, আমিই দেব। আপনার কাছ থেকে দুয়েকটা কথার শুধু অ্যাড্‌ভাইস নিতে চাই।—কেন, আপনি কি বড্ড ব্যস্ত? তাহলে বরঞ্চ থাক্, আমি আবার আর একদিন আসব।"

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, তার দরকার নেই, আমি কিচ্ছু ব্যস্ত নই।"

অপরেশ শান্তার মুখের দিকে চাহিলেন। কথার মধ্যে প্রধান অংশ কোন্‌টি? আবার আর একদিন আসিয়া তাহাকে বিরক্ত না করিবার ইঙ্গিত? না, আজ এত শীঘ্র বিদায় লইবার জন্য তাহার কোনই ব্যস্ততা নাই, ইহাই মর্ম্ম?

শান্তা চিঠিগুলি পড়া শেষ করিয়া খামে পূরিতে পূরিতে বলিল, "তা এতে আমার মতামত নেবার বিশেষ কিছু দরকার ছিল না—আপনি যা ভালো বোঝেন তাই লিখে দিন।" একটু হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া এমনিও—আমাকে যতটা বাদ দিয়ে কাজ চালাতে পারেন, ততই বোধহয় ভালো।"

আশ্চর্য্য হইয়া অপরেশ বলিলেন, "সে কি! কেন বলুন তো?"

"এমনিই। আমি এর সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পার্চ্ছিনে। মনে করছি, অতসী, এলেই একেবারে ছুটি নেব।"

"তার মানে!!"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "মানে—আমি শক্তিমন্দিরের সভ্যপদ থেকে বিদায় নেব।"

অপরেশ বলিলেন, "হতেই পারে না। একেবারে অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমরা আপনাকে এত সহজে ছাড়তে পারি নে।"

"ছাড়লেই ছাড়া যায়।"

অপরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনার হঠাৎ আজ এমন অদ্ভুত অভিপ্রায় হল, জান্তে পারি ?"

"আমি বুঝতে পারছি, আমাকে দিয়ে আপনাদের কাজ ভালো চল্‌বে না।"

অপরেশ বলিলেন, "আপনার নিজের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?"

অসুবিধা অনেকটা নিজেরই বটে ; তবে সে কথা তো বলা চলে না। শান্তা বলিল, "না, আমার আর বিশেষ অসুবিধে কৈ—কিন্তু দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন, আমার সঙ্গে আপনাদের প্রায়ই মতের ঠোকাঠুকি হচ্ছে, সবতাতেই অমিল !"

"ও রকম ঠোকাঠুকিরও মাঝে মাঝে দরকার। নইলে পথ পরিষ্কার হয় না। এজন্যেই তো বিশেষ করে আপনার থাকা উচিত। অনেকেই মনে যা বোঝে, বাইরে তা দশজনের বিরুদ্ধে বল্‌তে পারে না। আপনার মধ্যে সে দুর্ব্বলতা নেই। আমি এই জিনিসটা বড্ড ভালোবাসি।"

শান্তা বলিল, "তা হলেও—"

বাধা দিয়া অপরেশ বলিলেন, "আরও একটা কথা—কিছু মনে করবেন না আশা করি—আপনার প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতার মধ্যেও আমি কোনও রূঢ়তার পরিচয় পাই নে। আপনার ব্যবহারটা আমার ভারি মিষ্টি লাগে।"

এ আবার কি রকম কথা ! শান্তার ভাল লাগিল না। সে বলিল, "ও আপনার নিজের সৌজন্য, ও কোনও কথাই নয়।"

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, "আমার সৌজন্য নয়—আপনার মাধুর্য্য। আপনার বিনয়টুকু আপনাকে আরও সুন্দর করেছে।"

শান্তা কোনও উত্তর দিল না।

অপরেশ বলিলেন, "যেদিন আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, সেদিন তো আমার যেন মনে হয়েছিল, আপনার আগ্রহ আছে অনেকখানি। আজ কি হল ?"

কি হইল, সে কথার উত্তর এক নিঃশ্বাসে বুঝানো সহজ নয়, সে নিজেই ভাল বোঝে নাই। বলিল, "এখন একথা থাক্। অতসী এলে পরে বোঝা যাবে।"

কাজের প্রয়োজন শেষ হইল বুঝিয়া শান্তা উঠিল।

অপরেশ প্রস্থানের উদ্যোগ না দেখাইয়া চেয়ারের পশ্চাৎদিকে অলস-ভাবে একটু হেলিয়া বসিলেন, "এক্ষুণি উঠচেন আপনি? আর একটু বসুন না!"

"কেন?"

"এমনি। বড্ড টায়ার্ড্ লাগ্‌চে।"

শান্তা অব্যবস্থিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

অপরেশ বলিলেন, "কেন—কাজ না থাকলে কি বস্‌তে পারেন না? মানুষের সঙ্গে মানুষের শুধুই কি কাজের সম্পর্ক?"

শান্তা গম্ভীরভাবে বলিল, "সব সময় নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার যোগ কাজের মধ্যে দিয়েই।"

অপরেশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ও!—হ্যাঁ, এর বেশী আমি কিছু এক্সপেক্ট্ কর্ত্তে পারি না। তবে আমার দিক্‌কার কথা অন্য রকম। আপনাকে আমি কেবল আমার কলীগ্ বলে মনে করি না, পরমাত্মীয় বলে মনে হয়।"

শান্তার চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তবু, অপরেশের কথার মধ্যে যে একটা গম্ভীর আবেগভরা আবহাওয়া ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল, তাহাকে হাল্‌কা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে শান্তা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

"এ কথাটা আপনার সম্বন্ধেই বেশী খাটে। সত্যি, আপনার মধ্যে এমন একটি সহজ সরলতা আছে, যা সবাইকে আকৃষ্ট না করে পারেই না। আপনার হৃদয়ের স্নিগ্ধতা আমি আমার মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করি বলেই আপনার সান্নিধ্য আমার এত ভালো লাগে।"

শান্তা বলিল, "আপনার এতটা পক্ষপাতিত্ব অনুচিত।"

অপরেশ হাসিয়া বলিলেন, "নিজের মূল্য মানুষ নিজে বুঝতে পারে না—সেজন্যে দর্পণ চাই। কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন বা নাই পারেন, আমি আপনার যেটুকু জেনেছি, তাতেই আমার শ্রান্তজীবনে অনেকখানি শান্তি দেবে।"

শ্রান্ত জীবনে? এর অর্থ কি?—অর্থ যাহাই হউক, এত স্তুতিবাদ শান্তার ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "এখন উঠ্‌তে পারি?"

অপরেশ বলিলেন, "আপনার খুসী। আপনাকে ধরে রাখবার তো আমার অধিকার নেই। যদি আপনি আমার আপনার জন হতেন, তাহলে হয়ত জোর কর্ত্তে অন্ততঃ আবদার কর্ত্তেও পারতাম। কিন্তু শুধুই কাজের সম্পর্ক যে।—আপনি সন্তুষ্টমনে যতটুকু স্নেহভাব দেখাবেন, ততটুকুই আমার সৌভাগ্য।"

ছিঃ, কথা বলার ভঙ্গি কি অস্বাভাবিক। শান্তা উঠিয়া পড়িল।

২৩

কলেজ হইতে ফিরিয়া সত্যকাম আজ আর বেড়াইতে বাহির হইল না। সান্ধ্যভ্রমণ তাহার প্রাত্যহিক অভ্যাসও নয়। বন্ধুবান্ধব জুটিলে হযত কোথাও বাহির হইযা পড়ে, নযত কচিৎ দুই একদিন একাকীও গড়ের মাঠে কিংবা নদীব ধারে ঘুরিয়া আসে। এই দুই তিন দিন ধরিযা সে কি যেন ভাবে। আজও ঘরে আসিযা কিছুক্ষণ একা একা বসিযা রহিল। ভাবনা জিনিসটি কোনদিনই তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয। যখন যে পথে তাহার চলিতে ইচ্ছা করে, অনাযাসেই সহজ সুন্দরভাবে সেই পথে চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং ভাবনা করিবার দবকাব কি ?

বিকালের জলযোগ সারিয়া সে ছাদে চলিযা আসিল। তখনও সূর্য্য একেবারে ডোবে নাই, শুধু ছিন্ন ছিন্ন মেঘের আড়ালে লুকাইয়া তাহাব রশ্মি নিষ্প্রভ হইযা আছে। একটু একটু হাওযার হিল্লোল আসিয়া টবের রজনীগন্ধাব গাছগুলিতে দোলা দিতেছে ; ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া প্রায নিঃশেষ হইয়া আসিযাছে, তবু একটি শেষ কুঁড়ি আজিও তাহাব স্পর্শে সাড়া দিল। আকাশেব দিকে চাহিয়া চাহিযা সত্যকাম মেঘের খেলা দেখে, আর মনের মধ্যে কেমন একটা অজানা পুলকের জোযার আসে। তাহার নূতন যৌবনে যে প্রাণের সাড়া পড়িযাছে—কোন্ পথে কতদূরে গেলে তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা মিলিবে, সত্যকাম তাহাই ভাবে।

সুষমা ও শান্তা ছাদে আসিলেন। ওপাশে পায়ের শব্দ শুনিয়া সুষমা মাঝখানের দরজাটির মধ্য দিযা মুখ বাড়াইযা বলিলেন, "সত্য-ঠাকুরপো বুঝি ?"

ফুলগাছগুলির পরিচর্য্যা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ; জলের ঝাঁঝরী লইয়া তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত হইলেন।

শান্তা বলিল, "কাকীমা, গোলাপ গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌চ ?"

"পোকায় শেকড় কেটেছে।"

কতক্ষণ বাদে সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বৌদিকে দেখ্‌চি না যে—ঠাকুরপো ?"

সত্য ওদিকের ছাদ হইতে উত্তর করিল, "কারা সব এসেচেন দেখলাম।"

সুষমা বলিলেন, "কারা গো ?"

সত্য হাসিয়া বলিল, "আমি কি নাম জানি ? আপনাদেরই সব পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব।"

সুষমা বাকী টবগুলিতে জলসেচন করিয়া ভুঁইচাপা দুইটির সদ্যোজাত অঙ্কুরের প্রতি তত্ত্বাবধান করিয়া বলিলেন, "যাই একবার প্রভার কাছে—দেখে আসি গে'।"

শান্তা বুঝিল, কাকীমার সান্ধ্যভ্রমণ এখানেই সাঙ্গ হইল, আর রাত্রের পূর্ব্বে ফেরা হইবে না।

"যাও।" বলিয়া শান্তা অলসভঙ্গিমায় দেহ ফিরাইয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

সুষমা সত্যকামের সম্মুখ দিয়া নামিয়া গেলেন। সত্য তখনও ছাদের ওপাশে দাঁড়াইয়া। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিতেছিল, এপাশে চলিয়া আসে। কিন্তু তবু কেমন ইতস্ততঃ। আসিয়া সে করিবে কি ? কি বলিবে—কেমন করিয়া বলিবে ? অনেকক্ষণ পরে সত্যকাম আস্তে মাঝ-খানের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া চৌকাঠে পা দিয়া থামিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরাগ শান্তার পশ্চিমাভিমুখী মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। বাতাসের মৃদু ঢেউ কপালের উপরকার চুলের গোছা লইয়া খেলা করিতেছে।

শান্তার দক্ষিণহাতে মুখের অর্দ্ধেকখানা ঢাকা পড়িয়াছে। সত্যকাম সেই অর্দ্ধাবৃত মুখের উপর সন্ধ্যার শেষ রশ্মির বিচিত্র ক্রীড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুকের মধ্যে উচ্ছ্বাস ফেনাইয়া উঠিল।—দূর ছাই! এখানে নির্ব্বোধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি লাভ হইতেছে? কাছে অগ্রসর হইতে কিসেব এমন ভয়?

শান্তার পিছনে আসিয়া একটু দূবে দাঁড়াইয়া সত্যকাম ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখচেন?"

শান্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আকাশ।"

"কি ভাবছিলেন?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কিছু না।"

আর কোনও প্রশ্ন না কবিযা সত্যকাম একবাব পশ্চিমের দিকে চাহিল, একবার পূবের আকাশে। চারিদিকে অসীম প্রকৃতির বুকে চঞ্চল মেঘের খেলা, তাহার মৌন আনত মুখে অনুরাগের গোলাপী আভা। সত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। প্রকৃতির এই মাধুরীধাবা আজ এই মুহূর্ত্তে যেমন করিয়া সে নীরবে সর্ব্বাবয়ব দিযা পান করিতেছে, মানুষেব হৃদযের মধু যদি তেমনই নিঃশব্দে প্রিযের প্রাণে সঞ্চারিত হইত, তবে তো ভাষার দারিদ্র্যে ক্ষোভ ছিল না কিছুই।

সে শান্তার মুখোমুখি ফিরিযা দাঁড়াইযা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করি যদি, আপনি রাগ করবেন?"

শান্তা কৌতুকভরে তাহার দিকে মুখ তুলিযা বলিল, "কি কথা আগে শুনি?"

ইতস্ততঃ করিযা সত্য বলিল, "বল্‌ব?"

"বলুন।"

"বারীনবাবুর সঙ্গে আমার তফাৎ কি ?"

শান্তা বলিল, "তফাৎ ? কিছুই না।"

"সত্যি করে বলুন না ?"

"বাঃ! এ তো ভারি আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—বারীন বারীন, আপনি আপনি, এই তো দেখচি তফাৎ। তা ছাড়া আবার কি ?"

অল্প একটু হাসিয়া সত্য বলিল, "সে আমিও জানি। কিন্তু সে কথা বল্‌চি না। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের দুজনের পার্থক্য কোথায়, সেইটুকু জান্তে চাই।"

"আমার কাছে পার্থক্য কিছুই নেই তো!"

"তবে ব্যবহারের তারতম্য হয় কেন ?"

"তারতম্য কোথায় দেখ্‌লেন ?"

সত্য তাহার চোখের উপর আপনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, "সত্যি নেই ?"

শান্তা একটু ভাবিয়া বলিল, "আপনিই দেখিয়ে দিন্ না ?"

সত্য থামিল। যাহা নিজে দেখা যায়, তাহাই কি অন্যকে দেখানো যায় নাকি ? যাহা অন্তরে অনুভব কবা যায, তাহাই কি বাহিরে প্রকাশ করা চলে ? অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া সত্যকাম মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, "বারীনবাবুব সঙ্গে আপনি যে ভাবে কথা বলেন, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তো তার কাছাকাছিও দেখতে পাইনে।"

শান্তা বিস্ময় প্রকাশ কবিযা বলিল, "সত্যি!!—কিন্তু বারীনের সঙ্গে যে আমার আলাপ কত বছর থেকে!"

"বারীনবাবুব সঙ্গে আপনার যে ক'দিনের পরিচয় আপনিই বলেছেন, আমার সঙ্গে কি তার চেয়ে কম ?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "দিন গুণে দেখলে তা নয় অবিশ্যি, কিন্তু—"

"অথচ আপনি তাকে 'তুমি' বলে বলেন, আর আমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাই বলেন না!"

এই কথাটুকুর জন্য! শান্তা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে অজানিত লজ্জা আসিয়া বুকের মধ্যে মাথা তুলিল। চক্ষু নামাইয়া লইয়া স্তিমিত সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "আপনার সঙ্গে কথা বলি না, কে বল্লে? বলি তো!—তা ছাড়া, আপনি জানেন না তো বারীনকে কি রকম আত্মীয় বলে মনে হয়!"

সত্য অভিমানভরা সুরে বলিল, "আমিও কি কর্লে আপনার আত্মীয় বলে গণ্য হতে পারি, উপায় বলে দিতে পারেন? এত চেষ্টা করেও কেন যে আপনাকে খুসী কর্ত্তে পারিনে তা জানিনে। আমারই দুর্ভাগ্য!"

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, তা নয়। খুসী যে আমি সর্ব্বদা হয়েই আছি।—আসল কথা কি জানেন, বারীনের সঙ্গে কোথায় যেন আপনার একটা প্রভেদ আছে—আপনারা দুজন দুই ধরণের।"

সত্য বলিল, "সেই প্রভেদটাই তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। যদি দেখিয়ে দিতেন, আমি দূর কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তাম। বারীন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে, আমারও কি সে অধিকার নেই?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ।"

"বারীনকে যে-নামে ডাক্‌তে পারেন, আমাকেও পারেন?"

শান্তা বলিল, "ডাকা-না-ডাকার মধ্যে কি আছে বলুন? ওটা বাইরের জিনিস।"

"বেশ তো! তাৎপর্য্য নাই থাক্‌ল, ডাক্‌লে ক্ষতি তো নেই?"

একেবারে নাছোড়বান্দা!—শান্তা বলিল, "একবার আপনাকে 'আপনি' বলে ডেকে যখন ফেলেছি, তখন আবার বদ্‌লানোতে লাভ কি?"

"আমার যদি লাভ থাকে?"

শান্তা বিপদে পড়িল। খানিক ভাবিয়া বলিল, "আসল কথা কি জানেন—যে ডাকটা যার বেলায় স্বাভাবিক ভাবে মুখে আসে সেইটেই ডাকা ভালো না?"

সত্য বলিল, "বারীনবাবুর বেলায় যে 'তুমি' স্বাভাবিক ভাবে আসে, আমার বেলায় সেটা স্বাভাবিক হয় না কেন?"

শান্তা মনে মনে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো!—ত্রস্তে অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া খুঁজিবার চেষ্টা করিল, এমন হয় কেন? বারীন্দ্রকে প্রথম দর্শনের দিন হইতে যেমন সরল স্নেহের আবেষ্টনে টানিয়া লইতে দ্বিধা হয় নাই, সত্যকামের সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম কেন? বারীনকে যে সম্বোধনে অভিনন্দিত করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রশ্নমাত্র মনের মধ্যে জাগে নাই, সত্যকামের প্রতি তাহা প্রয়োগ করিতে গেলে মুখ বাধিয়া যায়। এ সংকোচ কিসের? সত্যকামের সম্মুখে তাহার স্বাভাবিক সরলতা কোথায় অন্তর্হিত হয়? আশ্চর্য্য!—বিব্রত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সত্যকাম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এবার থেকে বল্‌বেন বলুন?"

ইতস্ততঃ করিয়া শান্তা উত্তর করিল, "চেষ্টা করব।"

হাসিয়া সত্য বলিল, "চেষ্টা? আচ্ছা, সেই যথেষ্ট!"

শান্তা আর কিছু বলিল না।

সত্যকাম আবার বলিল, "দেখুন আপনি বল্‌ছিলেন, যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, সেইটেই ডাকা ভালো, না? কথাটা দুদিক থেকেই প্রযোজ্য বলে ধরে নিতে পারি?"

তাৎপর্য্য না বুঝিয়া শান্তা তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল, "বুঝলাম না।"

"কথাটা এতই শক্ত?"

শক্ত বিশেষ কিছুই ছিল না, কারণ পরমুহূর্ত্তেই অর্থ বোধ করিয়া শান্তা

আবার লজ্জা পাইল। সত্যকামের কী যে সব আবদার!—কিন্তু তাহার আবদার এড়াইবার উপায় কি? দরকারই বা কি? বারীনকে যে অধিকার সে স্বচ্ছন্দে দিয়াছে, সত্যকামকেও সেটুকু দিতে আপত্তির কারণ কি? কিছুই না।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ তো। আপনার যেমন খুসী!" মনে মনে বিচার করিল—কিন্তু বারীন তো তাহাকে 'তুমি' বলে না।

অজ্ঞাতে কোন্‌কালে অন্ধকারের অন্তরাল হইতে চাঁদ উঠিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্না মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণতর হইয়া দেখা দিল। পায়ের তলা হইতে গায়ে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে। শান্তা চারিদিকে চাহিয়া গা ঝাড়া দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া বলিল, "যাই এবারে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে।"

সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, "নীচে এখন কি কাজ?"

"বই পড়ব।"

"বই পড়তে এত ভালোও লাগে?"

শান্তা সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "আপনার মত ফাঁকিবাজ আমি? সাধনা না কর্লে কখনো সিদ্ধি হয়?"

"আপনার আবার এখন কিসের সিদ্ধির প্রয়োজন? পরীক্ষার বিভীষিকা তো আমাদেরই চোখের সাম্‌নে!"

"পরীক্ষা ছাড়া আর পড়া থাক্‌তে নেই?"

সত্য বলিল, "সে থাক্‌গে'।—কিন্তু আপনি কথা রাখ্‌ছেন না তো?"

"কি কথা?"

"এক্ষুনি কথা দিয়ে এরি মধ্যে ভুলে গেলেন?"

"আচ্ছা—কাল থেকে—।"

"আজই বলুন না?"

নাঃ, এ বড় অতিরিক্ত আব্দার। এত শীঘ্র কখনও কথা বদ্‌লানো যায়? শান্তা মনে মনে চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

উত্তরের অপেক্ষায় কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সত্যকাম হঠাৎ যেন গম্ভীর হইল। আগ্রহে, আবেগে, সঙ্কোচে ও ভয়ে মিলিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে অদ্ভুত ক্রীড়া চলিতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া সে বলিল, "বল না, শান্তা?"

শান্তার সমস্ত অঙ্গে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। এমন অস্বাভাবিক অনুভূতি তো তাহার সারাজীবনেও হয় নাই। এ হইল কি? সে স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার কানের মধ্য দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত রক্ত যেন মুখে ছুটিয়া আসিল। সত্যকাম দেখিয়া ফেলে নাই তো? না, না।—আপনার ভিতরকার এই আলোড়নে শান্তা আপনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। ছিঃ, সে কি পাগল হইল? বারীন যেমন, সত্যকাম তো তেমনই তাহার ভাই। তাহার মুখের স্নেহসুলভ এই একটি সম্বোধনে এত বিচলিত হইবার কি আছে? নিজের উপর ধিক্কার দিয়া শান্তা ভাবিল, সত্যকাম এত সহজে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ অধিকার করিয়া লইতে পারিল, সে সেটুকু পারিবে না? অর্থহীন লজ্জার বাধায় সরল সৌহার্দ্দ্যকে বিকৃত করিয়া রাখিবে?

অতিপ্রয়াসে সহাস্যমুখে সে উত্তর করিল, "হাঁ বল্‌ব। যাও তো এখন লক্ষ্মীছেলের মত পড়াশুনো কর গে'।"

সত্যকাম উৎফুল্লচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "যাচ্ছি। আর আমার আপত্তি নেই—এখন যা বল্‌বে তাই।"

২১

কলেজে ভর্ত্তি হওয়া অবধি পূজার ছুটির মাঝখানে দিন কয়টা সত্যকামের তাড়াতাড়ি কাটিয়া গেল—একেবারে চোখের নিমিষে দেখিতে না দেখিতে। এক সপ্তাহ হইতেই সে দিন গুণিতেছে—কতকটা বাড়ী যাইবার আগ্রহে, কতকটা কলিকাতা ছাড়িবার আশঙ্কায়। আজ একেবারেই ছুটি আসিয়া পড়িল। আজই সত্যকামের বাড়ী রওনা হইবার কথা। বৃদ্ধ পিতা দেশে, বারবার তাগিদ্ আসিতেছে ছুটি হওয়ামাত্র দেশে চলিয়া যাইতে।

তিনটার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়াই সত্যকাম দেখিল, প্রভা তাহার যাইবার দ্রব্যাদি সাজাইয়া গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং সে স্বয়ং একেবারে নিশ্চিন্ত।

সুষমার ঘরে আসিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া সত্যকাম বলিল, "আজ্‌কে যাচ্ছি বৌদি।"

"শুনেছি।—ভালো কথা, শোন ঠাকুরপো, তোমাকে একটা ফরমাস দিয়ে রাখি—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সত্যকাম অতিবিনয় পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া বলিল, "আজ্ঞা করুন!"

সুষমা হাসিলেন, "দেওর হয়ে জন্মেছ, আজ্ঞা পালন কর্ব্বে না তো কি?—শোন, তোমাদের দেশে শুনেছি সুন্দর সুন্দর পাটের সুতোর আসন সতরঞ্চ পাওয়া যায়? ফিরে আস্‌বার সময় আমার জন্যে দু'তিনখানা আসন আনতে ভুলো না, পরে দাম দিয়ে দেব।"

সত্য কহিল, "যে আজ্ঞে।"

খানিক পরে মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তাকে দেখ্‌ছি নে যে?"

সুষমা বলিলেন, "সে অতসীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছে।"

সত্যর হঠাৎ অভিমান হইল। আজ কি বেড়াতে না গেলেই চলিত না? আজ বিকেলবেলা সে দেশে চলিয়া যাইবে, ইহা শান্তা জানে না?—কিন্তু জানিলেই বা কি? তাহার থাকা-না-থাকা লইয়া শান্তা তো মাথা ঘামায় না! সত্যকাম নিজের মূর্খতাকে মনে মনে ধিক্কার দিল। এই মেয়েটির নিকট হইতে সে কখনও বিরূপ ব্যবহার পায় নাই সত্য, কিন্তু সে তো তাহার স্বভাবের মাধুর্য্য! ইহাকে আশ্রয় করিয়া আরও অধিক দাবীর অধিকার তাহার যে একান্তই দুরাশা, এ জ্ঞানটুকুও তাহার নাই?

কতক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সত্যকাম চলিয়া গেল।

পাঁচটার সময় যখন সে যাত্রা করিবার জন্য নীচে নামিয়াছে, কালু ও বেণু গাড়ীর সামনে ভীড় করিতেছে, এমন কালে অতসীদের মোটরকার আসিয়া থামিল। শান্তা নামিয়াই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্লে?"

"দেশে।"

"আজই!"

"দেরী করে লাভ কি?"

"কবে ফিরবে?"

সত্যকাম একটু হাসিয়া বলিল, "যত দেরী করে ফিরি, ততই তোমার পক্ষে ভালো, না? ভয় নেই, তাই ফিরব—একেবারে যেদিন কলেজ খুলবে, সেদিন! এ ক'টা দিন তুমি স্বস্তিতে থাক্‌তে পাবে।"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "তুমি এত ঢং কর্ত্তেও পারো!"

সত্য বলিল, "সত্যি, আমি তোমাকে বড্ড জ্বালাতন করি!"

শান্তা ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল মাত্র।

সেই বিশেষ ধরণের হাসি! সত্যকামের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে সলীল হাসির আভাসেই সে আকৃষ্ট, বিমুগ্ধ অথচ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। ইহা কি ব্যঙ্গভরা? না। ইহা কি অসরল? তাহাও নয়। ইহা কি অভিমান? না, না, হইতেই পারে না—অন্ততঃ সত্যকামের এমন দুরাশা করিতে ভরসা হয় না। তবে ইহা কি? এই হাসিটুকুর পশ্চাতে শান্তা কিসের ইঙ্গিত জানায় সত্যকাম খুঁজিয়া পায় না। মুহূর্ত্তেকের এই ছটায় শান্তার অন্তরের কোনও নিভৃত কক্ষই তো তাহার সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে না! সত্য চাহিয়া চাহিয়া ভাবে; কিন্তু শান্তার প্রতিদিনকার পরিচিত আচরণের সঙ্গে ইহার কোনই সামঞ্জস্য পাওয়া যায না।

প্রভা নীচে আসিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সত্যকাম প্রস্তুত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল।

উপরে উঠিয়া শান্তা দেখিল, সুষমা ঘরে নাই—বোধ হয় ছাদে গিয়াছেন। তাহার আজ আর ছাদে যাইতে ইচ্ছা হইল না, হঠাৎ কেমন যেন অবসাদ ঘিরিয়া আসিয়াছে। বসিবার ঘরে আসিয়া জানালাব কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইল। অসংখ্য ছাদের উপরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, গতদিনের একপশলা বৃষ্টিতে কল কারখানার কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশি আর জমাট্ মেঘের অন্ধকার অনেকখানি কাটিয়া গিয়া আজিকার আকাশটা বেশ তাজা হইয়া উঠিযাছে। দেখিতে বেশ লাগে। কিন্তু তবু যেন তাহার চোখে স্তিমিত হইয়া দেখা দিয়াছে। চারিদিকে কী বিরাট্ নিস্তব্ধতা! আজ এত নীরব কেন? শান্তা অর্থহীন চোখে, চিন্তাহীন মনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের গভীর অতলতার মধ্যে কি আছে? শূন্য—শুধুই শূন্যতা? 'মহাযাত্রা শূন্য হতে শূন্যেতে প্রস্থান'? হয়ত তাই। হয়ত সকলই নিরর্থক, নিরুদ্দেশ। শান্তা বুকের

মধ্যে অনুভব করিল কেমন যেন ব্যথা ও ব্যর্থতা! অথচ কিসের জন্য? কোনও অভাব তাহার নাই, কোনও ব্যর্থতা জীবনে আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই! ম্লান সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তা ভাবিল, প্রকৃতির বিদায়বাসরের বিষাদঘন কালিমা অকারণেই তাহার মনে এমন করিয়া ছায়া ফেলিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার পংক্তি মনে পড়িল।

কিন্তু নাঃ, আর ভাল লাগেনা, বড় একা। কেহ একজন আসিয়া পড়িলেও তো পারে, অথবা অতসীর ওখানে আর কতক্ষণ থাকিলেও বেশ হইত!

বারান্দায় মৃদু পদশব্দ শুনিতে না শুনিতেই পর্দ্দা সরাইয়া বারীন্দ্র হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল।—"বাড়ীসুদ্ধু কোথাও কারো সাড়া নেই যে?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "আছেন সবাই। তাঁরা সব ছাদে, না হয় ওবাড়ীতে।" ঠিক সময়টিতে বারীনের আবির্ভাবে সে যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বারীন বলিল, "অন্ধকারে একা একা বসে কি কর্চ্ছেন আপনি?"

শান্তা অগ্রসর হইয়া হাতের কাছের সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালাইয়া বলিল, "অনেকক্ষণ এমনি বসে আছি কিনা, কখন্ অন্ধকার হয়ে গেছে টের পাইনি।"

বারীন বলিল, "থাক্ না—আঃ, আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মাটি কর্লেন! অন্ধকারটাই তো ছিল বেশ!"

শান্তা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল তো?"

বারীন্দ্র বসিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সসঙ্কোচ সারল্যের সঙ্গে বলিল, "প্রখর উজ্জ্বলতার চেয়ে আমি অস্পষ্ট ছায়াকেই কেন যেন বেশী পছন্দ করি, দিনের চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোই সুন্দর, গানের চেয়ে তার রেশটুকু।"

শান্তা বিস্মিত কৌতূহলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কথা কয়টির মধ্যে যে গভীরতার আভাস ছিল, অনেক দিনের মধ্যে চারিপাশের আবেষ্টনে সে তাহা কোথাও পায় নাই। আগ্রহভরে কহিল, "সত্যি কিন্তু। আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ, জানো ?"

বারীন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যবাবু আজকে চলে গেছেন, না ?"

"এই ঘণ্টাখানেক আগে।"

বারীন বলিল, "আমিও যাব কাল। তাই আজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম।"

মনে করিয়া যে দেখা করিতে আসিয়াছে, ইহাও বারীনের পক্ষে অনেকখানি সহৃদয়তার পরিচায়ক মনে করিয়া শান্তা প্রসন্নমুখে হাসিল।

পশ্চিম দিগ্‌ভালে দ্বিতীয়ার বঙ্কিম চাঁদের রেখা ভাসিতেছে। একটুখানি যে আলো জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে সঙ্কোচে উঁকি দিতেছিল, ঘরের ভিতরকার অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুচ্ছটায় তাহা একেবারে লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। বারীন কক্ষ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া কতক্ষণ বাহিরের সেই চন্দ্রলেখার দিকে চাহিয়া রহিল। দুইজনে কেহ কোনও কথা বলিল না। বিস্ময়ের সাথে শান্তা অনুভব করিতে লাগিল, কি মধুর এই নিস্তব্ধতাটুকু !

বারীন খানিক পরে উদাসস্বরে বলিল, "বড় ভালো লাগ্‌চে।"

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া শান্তা বলিল, "হুঁ।"

"এই যে ভরা অন্ধকারের বুকে একখানি আলোর রেখা, এ দেখে কি মনে হয় শান্তাদি ?"

"কি মনে হয় ?"

"এর মধ্যে কিসের ইঙ্গিত আছে বল্‌তে পারেন ?"

"কিসের ?"

বারীন বলিল, "আঁধার ঘনিয়ে এসে যখন দিশেহারা করে দেয়, প্রদীপের শিখা তার পরমুহূর্ত্তেই আসে। চিরকাল ধীর অন্ধ ও বদ্ধ করে রাখা প্রকৃতির স্বভাবই নয়! আলোকে প্রিয় করবার জন্যেই এত অন্ধকারের আয়োজন। না? এই ক্ষীণ ধারাটুকু বেয়ে অসীম আলোর উৎসের সন্ধান পাব কবে?"

শান্তা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। এ যে তাহারই বুকের গীতছন্দের প্রতিধ্বনি, তাহারই আশৈশব স্বপ্নের প্রতিবিম্ব! বারীন এই স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে কবে হইতে? কৈশোরে যেদিন তাহাদের প্রথম পরিচয়, সেদিনও কি এই রঙ্গীণ কল্পনা তাহার ছিল? সেদিনকার দুইচারিটি বিনয়নম্র সসঙ্কোচ বাক্যালাপের মধ্যে ইহার সন্ধান তো পাওয়া যায় নাই! যাইবেই বা কেমন করিয়া? তখন সে যে শুধু একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত, নবাগত কিশোর—আপনার মাধুর্য্যময় স্বভাবের আকর্ষণে তাহাদের সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। তখন তাহাকে যতটুকু জানা গিয়াছিল, তাহাতে সে সুন্দর; আজ আর একটি দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া সে যেন শান্তার চোখে সুন্দরতর হইয়া দেখা দিল।

সস্নেহে হাসিয়া শান্তা বলিল, "বারীন, তুমি কবি?"

বারীন বিষম অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, "না, না, এম্নি বলছিলাম। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, কবি হতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ত্তাম।"

"তা তুমি হবে।"

"কি করে জানলেন?"

"তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পারচি। তুমি কথা কও কম, কিন্তু প্রকাশ কর্ত্তে পারো বেশী; হাসি তোমার মুখে লেগেই আছে, অথচ একটা যেন বিষাদের ছায়া—"

বারীন একটু হাসিয়া বলিল, "বিষাদ জিনিসটা বেশ, না? 'আওয়ার্ স্যুইটেস্ট্ সংস্ আর দোজ্ ছাট্ টেল্ অব্ স্যাডেস্ট্ থট্' (Our sweetst songs are those that tell of saddest thought)।"

কী অপূর্ব্ব সরলতা ও গভীর অনুভূতি মাখিয়া কথাগুলি বারীন উচ্চারণ করিল—শান্তা অবাক্ হইল। তাহার চক্ষে বারীনের অন্তরলোকের চারিপাশে যেন রহস্যজাল জড়াইয়া উঠিল। রহস্য? না, রহস্য কিছুই নাই—সে নিজেও তো এমনই কত কথাই অনুভব করে। কিন্তু তবু—বারীনের মনের অতলে এতখানি গভীরতা? কী ভাবে সে? শান্তার মত তাহারও চিন্তার রশ্মি বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর অবধি উদ্ভাসিত করিয়া দেখিতে চায়? তাহারও জাগ্রত জীবন সকরুণ স্নেহের স্পর্শ দিয়া বিশ্বজীবনকে অস্বাদন করিবার প্রয়াসী? চমৎকার!

বারীন খানিকপরে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা আস্ছেন না তো এখনও? যাবার আগে দেখা না করে—"

শান্তা বলিল, "ডাকব?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বারীন বলিল, "থাক্ তাহলে। এলে তাঁকে বল্বেন আমার কথা।"

"আচ্ছা।"

চুপ করিয়া আর একটু বসিয়া থাকিয়া বারীন সলজ্জ মৃদুহাসিতে ওষ্ঠপ্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া বলিল,—"এখন যাই তবে?"

বারীন চলিয়া গেল। শান্তা পূর্ব্বস্থানে বসিয়া পড়িয়া স্বস্তির সঙ্গে দেখিল—বিকালবেলাকার ভারাক্রান্ত মনটা কেমন লঘু হইয়া প্রাণময় আবেশে ভরিয়া উঠিয়াছে।

২২

লক্ষ্মীপূর্ণিমাতিথির বিশিষ্ট একটি গৌরব অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস হিন্দুপরিবারের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আর সকল দেবতাকে বাদ দেওয়া গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসম্পৎময়ী দেবীটিকে অপ্রসন্ন করিতে বড় ভয়। এই আশঙ্কাটুকু ইন্দুমতীর হৃদয়ে চিরদিনই প্রবল, সুতরাং গৃহিণী হইয়া অবধি মহাযত্নসহকারে নির্দ্দিষ্ট তিথিবারে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। পতিহীনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজার সমারোহের সংস্থান একদিকে যেমন কমিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই দেবদ্বিজে ভক্তি দশগুণ বাড়িয়াছে, সুতরাং অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিক্তির ওজন সমানই রহিয়া গেল। ফলে প্রতিবৎসরই রীতিমত আয়োজন সহ এই শারদীয় পূর্ণিমায় কমলার আরাধনা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আত্মীয় বন্ধু দুই চারিজনের নিমন্ত্রণও প্রচলিত রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

শান্তার এই দিনটিতে বড় উৎসাহ। সম্পদের লোভে পড়িয়া লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য স্বীকার না করিলেও, শুভ্র আলিম্পনের রেখায় রেখায় যে শোভা ও শুচিতা বিকশিত করিয়া শ্রীর আবির্ভাব হয়, তাহাতেই মনের সম্পৎ লাভ করা যায় অনেকখানি, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। এইটুকুর প্রতিই তাহার লোভ। ভোজনিমন্ত্রণের মধ্যে যে আড়ম্বর ও কোলাহলের প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাতে বিশেষ কোনও মাধুর্য্য তাহার চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু আজিকার এই উৎসবের নিমন্ত্রণ যেন কেমন একপ্রকার প্রাণের সৌহৃদ্য ও কল্যাণ সূচিত করে, ইহাই শান্তার ধারণা। প্রাতঃকাল হইতেই সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। আলপনার ভার

আগ্রহ করিয়া নিজে চাহিবা লইয়াছে। ঘরে ঘরে শ্বেতশতদল পাঁপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—মধ্যে মধ্যে কুঙ্কুমের রক্তাভায় উজ্জ্বল, মনোহর। বারান্দার দীর্ঘ দুই প্রান্ত বাহিয়া বরাবর সিঁড়ি পর্য্যন্ত ধানের ছড়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। চিত্র সমাপ্ত করিয়া চারিদিকে ভালো করিয়া দেখিয়া আপনার শিল্পনৈপুণ্যে শান্তা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

অতসী অভ্যাগতরূপে উপস্থিত। পদার্পণ করিয়াই সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাসিযা বলিল, "পা ফেল্‌তে যে জায়গা রাখিস্‌নি তাই!"

শান্তা বলিল, "জায়গা যদি নেহাৎ নাই পাও, তবে লক্ষ্মীর প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই পায়ের ছাপে ছাপে পা ফেলে এসো—কিছুমাত্র বে-মানান হবে না, তোমাকে!"

দুইজনে হাসিল।

"চমৎকার আল্পনা দিতে শিখেছিস্‌ কিন্তু সত্যি।"

কলাকুশলা বন্ধুর প্রশংসাবাদে শান্তা মনে মনে খুসী হইল। বলিল, "তোর মত মেয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট্‌ পাওয়া অবিশ্যি আমার পক্ষে গৌরবের কথা, না ভাই? আচ্ছা, তোব গুণের ভাগ আমায খানিক দিবি?"

অতসী হাসিল, গল্পপ্রসঙ্গে ইহাও জানা গেল সে বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছে। শান্তা বলিল, "আচ্ছা বল্‌তো দেখি কোন্‌ বিদ্যেটা তুই জানিস্‌ না?"

"দ্যাখ্‌ ভাই, অনেক কিছু শিখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সব হয়ে উঠ্‌ছে না। সময় পাইনে মোটে!"

"এত কি সময়ের অভাব ভাই?"

"বাঃ, এই তো দ্যাখ্‌ কতগুলো বই ষ্টাডি কর্ত্তে হচ্ছে; পরশুদিন

আবার একখানা যুযুৎসুর বই আনিয়েছি। সেদিন জাপান থেকে যে যুযুৎসু-ওস্তাদ এসেছেন, তাঁর সাথে একবার দেখা কর্ত্তে যেতে হবে। এই সব অনেক। তা ছাড়া শক্তিমন্দিরের আর সব অফিশ্যাল্ কাজ তো রয়েইছে! তোর মত ফাঁকি দিয়ে কাজ করি কি না?"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কি করব, আমার একটু কুঁড়েমি আছে জানোই তো!"

"তা বৈকি!"

শান্তা কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া হাসিতে লাগিল, "সামনের কমিটি-মিটিংয়ে আমি রেজিগ্‌নেশান লেটার পাঠাব, জানিস্?"

"সত্যি!"

"হ্যাঁ ভাই সত্যি।"

"আমি পাঠাতে দিলাম আর কি?"

"দ্যাখ্ অতসী, আমি বাইরে থেকে যতটা সম্ভব তোকে সাহায্য করব কথা দিচ্ছি। কিন্তু কমিটির সাথে আর সম্পর্ক রাখ্‌তে ইচ্ছে করছে না।"

"আচ্ছা তোর হয়েচে কি, বল্ দেখি।"

নির্ব্বিকারস্বরে শান্তা বলিল, "কিছু না।"

"কিছু না হয়ে পারেই না, আমি তো তোকে বরাবর জানি।"

শান্তা বলিল, "আসল কথা কি জানিস্, কমিটির সভ্যদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে কাজ কর্ত্তে আমার যেন অসুবিধে হচ্ছে।"

"তাই বল্লেই পারিস্!—কার সঙ্গে রে?"

শান্তা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সে আছে। তোর জেনে কোনও লাভ নেই তো!"

অতসী কি ভাবিয়া মুহূর্ত্তখানেক শান্তার মুখের দিকে তাকাইল; "আমি গেস্ করব?"

"তাতে কোনও লাভ হবে না। মোট কথা, আমার ভালো লাগচে না ?"

অতসী এবার হাসিয়া বলিল, "দূর বোকা, তার সঙ্গে রিজাইন্ দেওয়ার সম্পর্ক কি ? এখন তুই কম্বলকে ছাড়লেও কি কম্বল তোকে ছাড়বে ভেবেচিস্ ? এখন কমিটির ভেতরে আর বাইরে সমানই কথা যে রে !"

অর্থবোধ করিতে না পারিয়া শান্তা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুষমা দুয়ারে দেখা দিলেন, "কি গো, এবারে তোমাদের উঠ্‌তে টুট্‌তে হবে না ? এসো, খেতে এসো ?"

অতিথিগণ যথোচিত সৎকৃত হইয়া কখন্ বিদায় লইয়াছেন। বাড়ীর পরিজনগণও বহুক্ষণ হয় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া এখন নিদ্রামগ্ন, ভৃত্যদের শেষ কলরবও আর শোনা যায় না। মহানগরীর বুকের উপর নিদ্রাপরীর মায়ার কাঠির স্পর্শ লাগিয়া প্রতি অলিতে গলিতে স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে শব্দমাত্র নাই। কর্ম্মশ্রান্ত দিনমানের অন্তে বিশ্রামশান্তিতে সব নিস্পন্দ, নিঝুম! কোথা হইতে একটা মোটরকার হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিয়া গেল—নিশীথ রাত্রিতেও মানুষের কাজ কি ফুরায় না ? হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ—চাকার বিস্ফোরণ ধ্বনি! সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়হারা বিনিদ্র একটা পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তিরস্কার জানাইল।

শান্তার ঘুম ভাঙিল।—ও কিসের শব্দ ? মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিতে দেখিতে শব্দ মিলাইয়া গিয়াছে। আর কোনও কিছু সাড়া পাওয়া যায় না। শান্তা বুঝিল—না, কিছু নয়। আবার সযত্নে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু ঘুম একবার ভাঙিয়াছে, আর চট্ করিয়া আসিতে চায় না। একটুকাল চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিয়া সে কি ভাবিয়া চোখ মেলিয়া একবার চাহিল।

বাঃ, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি। ঘরে বাহিরে একি অপরূপ ছবি! ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না ছুটিয়া আসিয়া ঘরখানি একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর ও বাহির সব একাকার। খোলা জানালার মধ্যে কেবল গোটাকতক শিকের বাধা ভিন্ন আর কোথাও আলোকের গতি প্রতিহত হয় নাই—স্বচ্ছন্দে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে শান্তার শুভ্র শয্যার উপরে। শান্তার তন্দ্রার আবেশ টুটিয়া গেল। সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া সে শিয়রের বালিশটা একটু পাশে সরাইয়া মাথার কাছের জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। এমন পরিপূর্ণ পূর্ণিমার অনাবৃত সৌন্দর্য্য এই বস্তুতন্ত্রের কঠোর কারখানার মধ্যে বসিয়া সে যেন আর কোনদিন দেখে নাই। আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা? তাই বটে! এই অকলঙ্ক যামিনীর অসীম-ব্যাপ্ত উদার সুনির্ম্মল হৃদয়গগন উদ্ভাসিত করিয়া আজ যদি লক্ষ্মীর আবির্ভাব না হইবে, তবে আর ইহার চেয়ে শুভলগ্ন কবে মিলিবে? ঘরের মেঝেতে ঐ আলপনার শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে—ঐ তার মাঝখানে মায়ের পাযেব অধিষ্ঠান এ তো শুধু কল্পনা নয়! চোখের সামনে ঐ যে জ্যোৎস্নার সুধাসমুদ্র মন্থন করিয়া বিশ্বের সমগ্র সুষমা মূর্ত্তিমতী হইয়া নামিয়া আসিযাছে ধরাতলে, প্রতি মানবের প্রাণে প্রাণে, এই তো লক্ষ্মী!—কোজাগর পূর্ণিমাই বটে! আজিকার এই মহিমোজ্জ্বল দিব্যবিভা সারারাত্রি জাগিয়া যে না দেখিল, তাহার এ রাত্রিই বৃথা। অনন্তবিসারী আকাশ-সাগরের কোথাও আজ কোনও স্পন্দন নাই, শব্দ নাই—অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণু যেন প্রাণময় হইয়া রহিয়াছে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কোন্ রহস্যময় বাণীর গুঞ্জরণ! নির্ব্বিকার নারায়ণের চিন্ময় নীলবক্ষ, তাহাতেই বুঝি লগ্ন হইয়া আনন্দময়ী লক্ষ্মী! শান্তার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে কাঁপিয়া উঠিল। —আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে কোথা হইতে দেখা দিল অস্পষ্ট ছায়ার মত শুভ্র মেঘখণ্ডের একটুখানি আস্তরণ। গায়ে গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া

আবার কোন্ প্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া রহিয়াছে। এ যেন অপ্সরার বসনাঞ্চল। সুর-সভাতলে নৃত্য করিতে করিতে বিবশা উর্বশীর আলুলায়িত বসনপ্রান্ত লুটাইয়া পড়িল কি? ঐ যে তাহার অঙ্গের শত মাণিক্যের দ্যুতি, ঐ যে সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া টুটিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে তাহার অঙ্গের কিরণ। এত শোভা এই বিশ্বসাম্রাজ্যে আছে? কে এ অমৃতভাণ্ডার তাহার সম্মুখে উজাড় করিয়া দিল? এ যেন আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্তি হয় না। দূর হইতে দূরান্তরে তাহার চক্ষু দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল, স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে ঢাকা ঐ গভীর অম্বরের গভীরতর অন্তররাজ্যে আরও কি আছে? শেষ সীমানা কত দূরে—কোন্ আনন্দে দীপ্যমান? শান্তা অজানা আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মনে হয়, আজ তাহার সব আকাঙ্ক্ষা বুঝি পূর্ণ হইয়াছে, আজিকার এ ভরা সৌন্দর্য্যের মধুসায়রে ডুব দিয়া সে যেন আপনার সব ভুলিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এমনই পড়িয়া থাকিতে পারে!

কিন্তু বড় যে একা! এতখানি আনন্দ, এতখানি প্রাণের আবেগ ক্ষুদ্র এই হৃদয়টুকুর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? এমন পরিপূর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটুখানি ফাঁক থাকিয়া যায় যে! ইচ্ছা করে, আপনার সমস্ত আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেমের উচ্ছল প্রবাহে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে। ইচ্ছা করে, আপনার হৃদয়ের প্লাবনে সমস্ত প্লাবিত করিয়া দেয়। একাকী এ অসীম ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই। এমন আর একটি প্রাণ কি নাই, যে তাহারই মত আজ মুগ্ধ, আত্মহারা,—যে তাহারই মত আর একটি প্রাণ খুঁজিয়া ফিরিতেছে? কে আছে? কোথায় আছে? কাহাকে বুকের কাছে নিবিড় করিয়া পাইলে আজিকার আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত? সে কী অপার্থিব পুলক—দুইটি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের স্বপ্নমাখা বিপুল অনুভূতি—আত্মহারা ভালোবাসায় একীভূত, বিশ্বব্যাপী! অজানা

সাথীর অপরূপ কল্পনায় শান্তা বিভোর হইয়া রহিল। অনন্ত অম্বরের সুগভীর রহস্যতল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—সত্যকামের মুখখানি!

শান্তার আবেশ টুটিয়া গেল। এ কি? ছি, ছি, ছি!! আপনার কাছে আপনার ছবি ধরা পড়িয়া শান্তা লজ্জায় মরিয়া গেল। এই তাহার কুমারীব্রত? তাহার সংকল্পের দৃঢ়তা ও শক্তির গৌরবের তলায় এমনই করিয়া সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া থাকে? সত্যকাম? ছিঃ! অসম্ভব, হইতেই পারে না। এ তাহার মস্তিষ্কের ভ্রান্তি। নূতন অনুভূতির অপূর্ব্ব পুলকে ও নিজের দুর্ব্বলতার আকস্মিক আবির্ভাবে বেদনায় তাহার বুকের মধ্যে কী রকম করিতে লাগিল। নিদ্রার বিস্মৃতির মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টায় সে তাড়াতাড়ি বালিশের মধ্যে আরক্ত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল।

২৩

দুপুরবেলা শান্তা শুইয়া শুইয়া কাগজ পড়িতেছে, পাশে সুষমা মাণিককে লইয়া নিদ্রাগতা।

অর্দ্ধেক ভেজানো কবাট ঠেলিয়া প্রভা ঘরের মধ্যে একটুখানি উঁকি মারিলেন, "কই গো? সব একেবারে নিঝ্‌ঝুম যে!"

শান্তা খবরের কাগজখানা চোখের সাম্নে হইতে নামাইয়া ধরিল। প্রভা লঘুপদে ঘরে ঢুকিয়া সুষমার কাছে আসিয়া আবার থামিলেন, "থাক্ গে, বিরক্ত করব না। কাকীমাকে বলিস্, ঘুম থেকে উঠেই আমার কথা শুনতে যেতে।"

শান্তার হাতের কাগজগুলার খস্ খস্ শব্দ এবং প্রভার কলকণ্ঠের ধ্বনিতে সুষমার পাৎলা ঘুম টুটিয়া গেল।

তন্দ্রালস চক্ষু মেলিযা বলিলেন, "কি গো, দুপুবেলা আবাব আমার ঘুম ভাঙাতে এসেছ কি কর্ত্তে শুনি?"

প্রভা হাসিয়া বলিলেন, "শুধু দুপুরবেলা কেন, রাত্রের ঘুমও মাটি কর্ত্তে চাই।"

"ব্যাপার কি বল তো দেখি শুনি!"

ব্যাপারটি বিশেষ কিছু নয়। প্রভার আজ বায়োস্কোপ দেখিবার সখ হইয়াছে। স্বামীর কাছে কিছুক্ষণ আগে শুনিতে পাইয়াছেন, আজ পিক্‌চার প্যালেসে সুপ্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাস দেখানো হইতেছে। সুতরাং সেখানে যাওয়া চাই-ই। কিন্তু সুষমা না গেলে তাঁহার আসর ভাল জমে না।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাবে তো?"

ঘুম ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোৎসাহে সুষমা খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "দেখি, কি ফিল্‌ম্‌ আছে আজ ?"

"ওমা, থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স !" সুষমা নাচিয়া উঠিলেন, "যাব না আবার ?—কিন্তু, চড়নদারগিরি কর্ত্তে হবে কিন্তু তোমার কর্ত্তার, আমাদের ওঁকে দিয়ে হবে না।"

প্রভা বলিলেন, "তিনি রাজী।"

"তবে আর কি ?"

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মোটরের হর্ণ ফুঁকিয়া সকলে মিলিয়া রওনা হইল। একেবারে বরাবর থামিল গিয়া পিক্‌চার প্যালেসের গোড়ায়।

চারিদিকে লোকারণ্যের ভীড়ে দম বন্ধ হইবার উপক্রম, উগ্র আলোর ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে চায়। সেণ্ট্‌, পাউডার, সিগার, সিগারেটের গন্ধ মিশিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের খোরাক জুটিল বেশ। শান্তার মজা লাগিল। ফিল্‌মের দর্শনীয় ছবিখানির অপেক্ষা এগুলিও তাহার কম উপভোগের সামগ্রী নয়। অনেকদিন হইতেই মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় বড় নিঃসঙ্গ মনে হইতেছিল। যাহা হইক তবু আজিকার সন্ধ্যাটুকু সজীব চঞ্চলতার মধ্যে কাটিবে মন্দ নয়।

টিকিট করিয়া হলে ঢুকিয়া সুষমারা চারিখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন।

সভার দীপদাম ম্লান হইয়া গিয়াছে, চিত্রপটের উপরে আলো ফুটিয়া উঠিল। ছবি পড়িতে সুরু করিয়াছে। দর্শকমণ্ডলীর সহস্র চক্ষু একমুহূর্ত্তে গিয়া নিবদ্ধ হইল সেই দিকে।

সময় কাটিয়া চলে। অকস্মাৎ শান্তার নিবিষ্ট মনের একাগ্রতায় যেন বাধা পড়িল। নিজের অগোচরে অন্যমনস্কভাবে ছবি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া

চাহিয়া দেখিল, পাশের চেয়ারটিতে অপরেশ। কোনও নির্নিমেষ দৃষ্টি মুখের উপরে বহুক্ষণ ন্যস্ত থাকিলে অজ্ঞাতেও মনের মধ্যে কেমন যেন সাড়া পাওয়া যায়, শান্তা অনেকবার তাহা দেখিয়াছে। আজও কি তাই ?

হঠাৎ অনির্দ্দেশ্য এক অপ্রসন্নতা শান্তার মনটাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

পাশের দিকে একটুখানি ঝুঁকিয়া অপরেশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনিও এসেছেন ?"

শান্তা যেন এইমাত্র হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইল, "কে ? আপনি! ও।"

"কেন ? চিন্‌তেই পারেন নি ?"

"অন্ধকারে অতটা লক্ষ্য করিনি।" বলিয়া শান্তা আবার মুখ ফিরাইয়া ছবি দেখিতে বসিল।

তা বটে! অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। অপরেশ একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পটের পর পট পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। শান্তা অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত সেইদিকে চাহিয়া আছে। প্যারিসের বিচিত্র সৌধাবলী, রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরের রহস্যনিকেতন, রাণী অ্যানের সম্মুখে ডিউক্ অব্ বাকিংহাম্—চোখের সাম্‌নে সব ভাসিয়া চলিয়াছে।

অপরেশ শান্তার কানের কাছে মাথা আনিয়া আবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লাগ্‌চে ? এন্‌জয় করচেন বেশ ?"

আবার বাধা পাইয়া শান্তা একটু অশান্তিবোধ করিল। সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, বেশ।"

অপরেশ বলিলেন, "আমার কিন্তু লাগ্‌চে না,—ছবির চেয়ে বাস্তব ভালো। আসুন তার চেয়ে গল্প করি।"

শান্তার এবার ভারি রাগ হইল। জবাব না দিলে অভদ্রতা হইবে হয়ত, কিন্তু জবাব দিবার মত কোনও কথা মুখে আসিল না।

অপরেশ একটু ক্ষুব্ধভাবে হাসিয়া নিজেই বলিলেন, "আমার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে ভালো লাগ্‌বে না, না ?"

ভারী বিশ্রী ! শান্তা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "আপনার সঙ্গে বলে নয়। তবে গল্প দেখ্‌তে এসে গল্প করে সময় কাটালে সময় নষ্ট করা হবে, নয় কি ?"

"সময় নষ্ট ? বাড়ীতে যখন আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যাই, তখনও নিছক কাজের কথাটি বাদে কোনও কথা বল্‌তে গেলে আপনার সময় নষ্ট হয়, এখানেও দেখ্‌চি তাই। সময় তাহলে কোনদিনই হবে না, বলুন !"

নির্ব্বিকার সুরে শান্তা বলিল, "দরকার তো নেই !"

অপরেশ একটি মুহূর্ত্তে থামিলেন ; একবার সোজা হইয়া আবার হেলিয়া বসিয়া বলিলেন, "অথচ, জানেন—আপনার কাছ থেকে একটি বাজে কথা শুন্তে গিয়ে যদি আজকের সমস্ত ফিল্‌ম্‌টা দেখাই মাটি হয়ে যায়, তাতেও আমি লোকসান মনে করি না, আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার এত ভালো লাগে !"

শান্তা উত্তর দিল না। এই অস্বাভাবিক বাক্যালাপের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে দেরী হইল।

অর্দ্ধেক অনুনয়, অর্দ্ধেক দাবী মিলাইয়া অপরেশ বলিলেন, "কথা বলবেন না ?"

সব আলোচনা এক নিঃশ্বাসে থামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে শান্তা বলিল, "ছবি দেখুন।"

অপরেশ থামিতে পারিলেন না। আজ তাঁহার কী যে হইয়াছে, শান্তা

তো বুঝিতে পারেই নাই, তিনি নিজেই পারিতেছিলেন কিনা সন্দেহ। এই চিত্রশালার সুসজ্জিত সভাতলে, রাত্রির অস্পষ্ট আলো আঁধারের মধ্যে বসিয়া কেমন যেন তাঁহার দেহমনে একটা আবেশ কাঁপিয়া উঠিতেছিল; চোখের সামনে দিয়া উপন্যাসের লীলাখেলা ছবির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে কল্পনার কী যেন এক মোহন আবেষ্টন!

শান্তার উদাসীনতায় দৃক্‌পাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন, "আপনাকে আমার কতখানি নিজের বলে মনে হয়, আপনি জানেন না। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখি, সেদিন থেকেই কেবল মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুযুগের, যেন পূর্ব্ব জন্মান্তরেও আপনাকে একান্তভাবে পেয়েছিলাম। বলুন দেখি—"

শান্তা বাধা দিয়া বলিল, "এ রকমটা আপনার কাছ থেকে আমি আশা করিনি, অপরেশবাবু।"

অপরেশ আহত হইলেন, "কেন, আমি অন্যায় করেছি?"

"ন্যায় অন্যায় বুঝবার মত বিচার শক্তি আপনার থাকা তো উচিত!"

অপরেশ মৌন হইলেন। শান্তার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া চেয়ারের বিপরীত হাতলের গায়ে ঠেস দিয়া চিত্রপটের দিকে তাকাইলেন।

শান্তার মনের মধ্যটা যেন একটু কেমন করিয়া উঠিল। সে কি অযথা রূঢ়তার পরিচয় দিয়া ফেলিল নাকি? অপরেশ যাহা বলিতেছিলেন, তাহার মধ্যে সত্য সত্যই কি গর্হিত কিছু আছে? তিনি তাহাকে স্নেহ করেন—এই তো? স্নেহ তো কাকাবাবুও করেন! তাহাতে তো সে রাগ করে না।—ছি ছি, নিজের মনের মলিনতায় অন্যকে মলিন ভাবিয়া তাহার উপরে আবার তাহাকে পীড়া দেওয়া। বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

শান্তা নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে বসিল।

২৪

বিকালবেলা বসিবার ঘরে তর্ক চলিয়াছে। সত্যকাম আসিয়াছে, বারীন আসিয়াছে, আর শান্তা ও সুষমা। বারীন বলিতেছে, "লক্ষ্য কি তা জানিনে। কিন্তু লক্ষ্য একটি নির্দ্দিষ্ট না থাকলে পথ চলা অসম্ভব, এটা ঠিক। তাই তো খুঁজতে চেষ্টা করি।"

সুষমা বলিলেন, "অত বড় বড় কথা বুঝিনে ভাই। জগৎস্যষ্টির লক্ষ্য আর অর্থ নিযে মাথা ঘামাবার আমার অবকাশ নেই। দবকারই বা কি ? সোজা বুদ্ধিতে যা ভালো বলে মনে করি, তাই করে যাব। ব্যস্!"

যা ভাল বলিয়া মনে করি!—শান্তা মনে মনে একটু হাসিল। ভালই বা কি মন্দই বা কি—সেই কথাটা জানিবার জন্যই তো এত বাক্‌বিতণ্ডা! একনিঃশ্বাসে সুষমা কেমন করিয়া তাঁহার জীবন যাত্রাপথের সকল ভালোমন্দ নির্ণয় করিয়া ফেলিতেছেন, সে তো ধারণা করিতে পাবে না। তাহার যে প্রতি পদক্ষেপে ছোটখাট খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারে জটিল সমস্যার উদয় হয়। কতদিন এমন হইযাছে—একটি ফুলেব কুঁড়ি ছিঁড়িতে গিয়াও সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সাগ্রহে উপাদেয ভোজ্য মুখে তুলিতে গিয়াও প্রশ্ন জাগিয়াছে, লোভের এ তৃপ্তি-সাধন কিসের জন্য ? অন্যের চক্ষে এসব অত্যন্ত হাস্যকর প্রশ্ন। কিন্তু শান্তা যে ইহা লইয়াই বিব্রত হইয়াছে। যাহা উচিত তাহার এক পা এদিক ওদিকে কিছুতেই সে পা বাড়াইবে না, এই সংকল্প। অথচ উচিত-অনুচিত খুঁজিযা বাহির করিতেই যে জীবন কাটিয়া যায়।—শান্তা ভাবিতে লাগিল।

সুষমার এক নিমেষের সমাধানের উত্তরে বারীন আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, "সে হয় না কাকীমা। আচ্ছা শান্তাদি, আমার

কেমন যেন মনে হয়, জগতের আদি থেকে অন্ত জুড়ে আছে একটিমাত্র মণিহার—প্রেম, একটা সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী প্রেম। মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে দিয়ে লুকিয়ে থেকে সেই-ই সবাইকে সামনের পানে এগিয়ে দিচ্ছে।"

শান্তা অন্যমনে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। প্রেম? তাই কি? অসম্ভব নয়। এই প্রেম বস্তুটিকে সে-ও বড় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখে। তাহার নিজের মনের মধ্যেও এ যেন কেমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সে যেন কাহাকেও ভালো না বাসিয়া পারে নাই। পাছে কাহারও মনে একটু ব্যথা লাগে, এই আশঙ্কায় সে নিজের স্বাভাবিক ভালোলাগা-মন্দলাগাকে ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া সকল সময় সকলকে আচরণের মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সত্যই, প্রেম কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! শান্তার মনে হইল, এই অমৃতরসে চিরকাল ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই সে নিজেকে সার্থক মনে করে।—কিন্তু তাই কি? আর সকল প্রেরণা বিদায় দিয়া শুধু একমাত্র এই প্রেম কি তাহার সারাজীবনখানি ভরিয়া রাখিতে পারে? ভালোবাসিলাম আর ভালোবাসা পাইলাম—তাইতেই কি সব? আরও যে কত ফাঁক থাকিয়া যায়। প্রাণের সকল অভাব তো পূর্ণ হয় না! শান্তা প্রাণপণে একবার নিজের মধ্যে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—কি সেখানে আছে, আর কি নাই। কি পাইলে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে!—তৃপ্তি? তৃপ্তি হইলে যে সব ফুরাইল! আর তো করিবার কিছু থাকে না, চলিবার পথ থমকিয়া দাঁড়ায়। তাহাতে তাহার কি সুখ?—ঠিক্! শান্তা যেন হঠাৎ কিনারা খুঁজিয়া পাইল। ঠিক বটে! থামিয়া থাকাতে জীবনের সার্থকতা নাই, মানবাত্মার আছে অনন্তাভিমুখী গতি। তাই তাহাকে রুদ্ধ করিতে তাহার হৃদয় বেদনা পায়; তাই শুধু প্রেম লইয়া সে পূর্ণতার অনুভূতি পায় না। প্রেম যেন কেমন নিষ্ক্রিয়। সে যেন আলসে আবেশে মানুষের মনটাকে

নেশার মত জড়াইয়া রাখে। সামনে চলিতে বড় দেয় না। ভারি স্নিগ্ধ, ভারি মধুর! কিন্তু বাঁধিয়া যে রাখে, সেই তো তাহার দোষ! প্রেম ছাড়া আরও যে সহস্ররকম প্রবৃত্তি তাহার মনকে ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দেয়, তাহাদের সার্থকতা হইবে কিসে? তাহাদের প্রতি অন্ধ থাকিতে তো সে পারে না! বিশ্বপ্রকৃতি যখন তাহার চক্ষুর সম্মুখে আপনার বিচিত্র দুর্ব্বোধ প্রশ্নরাজি লইয়া আসিয়া দাঁড়ায়, সে তো তাহার প্রহেলিকা ভেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, সমস্ত দেহমন যেন মস্তিষ্কের মধ্যখানে ধীরূপে একত্রিত হইয়া উঠিতে চায়! জ্ঞানের অফুরন্ত পিপাসা থামাইয়া রাখিবার নয়। তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনখানির পদে পদে যখনই ছোটবড় নানাবিধ বাধা আসিয়া ভ্রূকুটি করে, তাহার সত্তার অণুতে অণুতে অমনই যেন শক্তিপ্রচেষ্টা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে সেগুলিকে দলিয়া চলিয়া যাইবার জন্য! যতই অক্ষম হইয়া পড়ে, যতই আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, ততই তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য লিপ্সা যেন আরও বাড়িয়া ওঠে, পরের কাছেই হউক, নিজের কাছেই হউক, পরাজয়ের অপমান সে যেন সহ্য করিতে পারে না! জ্ঞানের জন্য, শক্তির জন্য এই সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে সে যত আনন্দ পায়, শুধু প্রেম লইয়া সে আনন্দ সে তো পায় না। তাহাতে তাহার জীবন অসম্পূর্ণ। বারীনের মত যাহারা শুধু প্রেমকেই হৃদয়ের রাজা বলিয়া মানিয়াছে, সে তাহাদের একজন নয়। তাহার জীবনের অলক্ষ লক্ষ্য—সীমাহীন জ্ঞান, অপরাজেয় শক্তি, অগাধ প্রেম। কোনও একটিমাত্রকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া বরণ করিতে পারে না। সুদূরগামী বন্ধুর তাহার চলিবার পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি', প্রেম তাহার সেই যাত্রাপথে মলয়ানিল হইয়া পথের দুর্গমতাকে একটুখানি অপসারিত করিয়া দিবে, এই মাত্র।

শান্তা বলিল, "না ভাই, সে আমি মনে কর্ত্তে পারিনে। শুধু ভালোবাসা দিয়ে জগৎ রহস্যের ব্যাখ্যা হয় না। আমি তো অন্ততঃ পাচ্ছি নে। জানো প্রেম যেন জ্যোৎস্নার মত শুধু স্নিগ্ধই করে, কিন্তু যথেষ্ট আলো দেয় না। তাতে করে জীবনের সবখানি কাজ চলে না, রোদেরও একটু দরকার।"

বারীন উত্তর করিল না।

শান্তা আবার বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বল তো—তুমি কি চিরকাল এমনি অস্পষ্ট আলো-আঁধারে তৃপ্ত থাকতে পারো ?"

একটুখানি হাসিয়া বারীন বলিল, "বোধহয় পারি।"

সত্যকাম এতক্ষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শান্তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া সুষমাকে বলিল, "আসুন বৌদি, আমরা ক্যারম্ খেলি। ওসব দার্শনিক বক্‌বকানি আর বরদাস্ত হচ্ছে না—আমার ধাতে সয় না।" ঘরের ওপাশে দেয়ালের কোণ হইতে ক্যারম্‌বোর্ডটি টানিয়া গুটিগুলি উবুড় করিয়া ঢালিয়া সত্যকাম বলিল, "আসুন বৌদি।"

শান্তা ফিরিয়া তাকাইয়া একটুখানি হাসিল। বারীন বলিল, "দেখুন শান্তাদি, জীবজগতের মনস্তত্ব খুঁজে দেখ্‌লে কি পাওয়া যায় বলুন তো ?"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পাওয়া যায় ?"

"আমি বলি—আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে।"

"ঠিক, তাই বটে—আমিও বলি।"

"তবে ?"

"তবে কি ?"

"সেই জন্যেই তো বল্‌চি, জীবনের মূল হচ্ছে প্রেম। প্রেম আর আনন্দ একই তো জিনিস—ঠিক যেন দুধ আর ক্ষীর। একটা আর একটার গাঢ় সংস্করণ। নয় ?"

শান্তা হাসিয়া একটু মাথা দোলাইয়া বলিল, "ঠিক বলতে পারি না। প্রেমে আনন্দ অনেকখানি আছে জানি, কিন্তু সবখানিই আছে, একথা কি করে বলি বল? অন্ততঃ আমার নিজের কথা তো বল্‌তে পারি, আবার আনন্দের জন্যে আরও অনেক কিছুর দরকার।"

একটু থামিয়া আবার বলিল, "জানো বারীন, ভালো আমিও বাসি, বড় বেশী ভালোবাসি মানুষকে। কিন্তু সেই জন্যে বুঝতে পারি, শুধু প্রেমে হয় না। মানুষ আনন্দ খোঁজে। সে আনন্দ আমি তাকে দেব কেমন করে? শুধু ভালোবেসে? তা কি হয়। আনন্দলাভের পথটি খুঁজে বার কর্ত্তে গিয়েই তো আমার সুস্পষ্ট জ্ঞানের দরকার। কি করে পৃথিবীর এই দুর্গম বনজঙ্গল সাফ করে তার মধ্যে দিয়ে ঐ পথ কেটে বার করে আলোর সন্ধান দেব, সেই জন্যেই তো আমার দুর্দ্দম শক্তি চাই। বুঝতে পারো না? শেলীর স্কাইলার্কের মত শুধু ভালোবাসার নেশায় মশ্‌গুল হয়ে ভাবের আকাশে বিচরণ করলেতো চলে না। চাই সূক্ষ্ম চিন্তা আর কঠোর শক্তি।"

দেখিতে দেখিতে কথার স্রোত মুখ ফিরাইল, দর্শনের গবেষণা সাহিত্যের চর্চ্চায় নামিয়া আসিল। বারীন আরম্ভ করিল শেলী। শেলীর কবিতা তাহার কণ্ঠস্থ, কথায় কথায় আবৃত্তি। অনেকখানি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বারীন বলিল, "ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলীকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।"

শান্তা বলিল, "আমিও বাসি খুব।"

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বারীন বলিল, "ওঁর একটা কবিতা যা চমৎকার—আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অ্যাপীল করে সেইটে।"

"কি বল তো?"

"আপনি বলুন দেখি।"

"আমি কি করে জান্‌ব ?"

"আন্দাজ ?"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শান্তা বলিল, "ওড্‌ টু দি ওয়েষ্ট্‌ উইণ্ড্‌ (Ode to the West Wind) !"

মাথা নাড়িয়া বারীন বলিল, "না। ওসব আপনার ফিলজফিতেই ভালো লাগবার কথা, আমারটা অন্য রকম।"

"তবে জানি না।"

"বলুন !"

"তুমি বল।"

বারীন হাসিয়া বলিল, "না থাক্‌, বলব না।"

"কেন ?"

কথা না বলিয়া সে শুধু মৃদুহাস্যে শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বারীনের এই সরল অথচ সলজ্জ হাসিটুকু শান্তার বড় ভাল লাগে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, বল না ?"

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বারীন বলিল, "টু এ লেডি উইথ্‌ এ গিটার (To a lady with a guitar)।"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ও !"

সুষমা ততক্ষণে খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন, "যাই দেখি একবার প্রভার ওখানে। বেণুর জ্বরটা ছেড়েচে ঠাকুরপো ?"

সুষমা চলিয়া গেলেন। বারীনও উঠিয়া দাঁড়াইল, "যাই আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"

শান্তা বলিল, "এসো।"

আকাশে রেখার মত একটু চাঁদ উঠিয়াছে—শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ। জানালা দিয়া ফুরফুর করিয়া হাওয়া আসিল। শান্তা উঠিয়া

গিয়া দাঁড়াইল—মনটা বেশ ভাল লাগিতেছে আজ। সেই মৃদু জ্যোৎস্না, সেই মলয় বাতাস বহিয়া আসিয়া অনাবিল একটা প্রেমের স্পর্শ যেন গায়ে বুলাইয়া যাইতেছে। ঠিক তাহার কল্পনার জগৎটি যেন!

সত্যকাম পিছন হইতে ডাকিল, "শান্তা!"

অন্যমনস্কভাবে সে জবাব দিল, "কি, বল।"

পরিহাসের সুরে সত্য বলিল, "থাক্, দরকার নেই। অমন মুখ ফিরিয়ে 'হাঁ, না' শুনবার জন্যে আমার কথা বলবার কিছু এমন দায় পড়ে নি।"

শান্তা একটু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপরের ফুলদানী হইতে একটি ক্রাইসেন্‌থিমাম্ তুলিয়া লইয়া দোলাইতে দোলাইতে সত্যকাম বলিল, "এসো একটু দার্শনিক গবেষণা করি। কেমন?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "দর্শন শাস্ত্রে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি! অনর্থক কথা বলে বাজে সময় নষ্ট করি না আমি কখনো।"

"ও বাবা!"

একটু চুপ করিয়া আবার সত্যকাম বলিল, "না, সত্যি। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, তুমি উত্তর দিয়ে সমাধান করে দাও। হ্যাঁ?"

"তোমার আবার সমস্যা? কি শুনি?"

"কেন, আমার থাকতে নেই? আচ্ছা শোন—"

"বল।"

ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সত্যকাম প্রশ্ন করিল, "তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক?—"

আশ্চর্য্য হইয়া শান্তা বলিল, "কে বল্লে?"

"তুমিই! আমার কাণ নেই বুঝি? ক্যারমের গুটির চটাপট্ শব্দের মধ্যেও তোমার কথাগুলো সেখানে গিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ পৌঁছেচে।"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "ভালো।—কিন্তু তুমি ভুল করছ। আমি বিশ্বপ্রেমিক, এমন কথা তো কক্ষণো আমি বলিনি, তবে হতে পার্লে ভালো হত। সেই চেষ্টা করচি।"

"তবে তাই। তাতেই যথেষ্ট! কিন্তু আমার প্রশ্নটা কি, জানো—"

একটু কুতূহলী হইয়া শান্তা বলিল, "কি?"

"তোমার বিশ্বের পরিধি কতটুকু জান্তে পারি কি?"

শান্তা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বের পরিধি? সে আবার কি? সত্যকাম তাহার জিজ্ঞাসু চোখের উপর একটা গাঢ় দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "বুঝতে পার্চ্ছ না?"

"না।"

"তবে থাক্।"

শান্তা বলিল, "থাক্‌বে কেন? হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা ভাষায় বল, তাহলেই বুঝতে পারব।"

অকস্মাৎ সত্যকামের মুখশ্রী যেন কেমন হইয়া উঠিল। ধীরে সে মাথাটা একটু নামাইল। অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় ও আগ্রহে শান্তার বুকের মধ্যেও দুলিয়া উঠিল—সত্যকাম কি কথা বলিবে কে জানে? সত্যের ঠোঁট দুখানা যেন একটু কাঁপিল, আনত মুখখানি তুলিয়া এবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিশ্বের মধ্যে—আমি—আমার একটুখানি স্থান আছে কি?"

শান্তা চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় রাঙা মুখখানি সত্যকামের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য সে হঠাৎ বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। নীচে বারান্দায় কেহ আসিল কি না, তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

তাহাকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে পলে পলে সত্যকামের হৃদয়ের মধ্যে যে একখানি প্রেমবিতান গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা সে অনেকদিন হইতেই মাঝে মাঝে অনুভব করে যেন। সত্যের প্রত্যেক বাক্য, ভঙ্গি, দৃষ্টির মধ্যে কি

যেন সরসতা ও গোপন মাধুর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকে। শান্তা বুঝিতে পারে উহা তাহারই জন্য। কিন্তু তাহা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয়। সত্যকাম তাহাকে ভালো—, না, না, অসম্ভব! হইতেই পারে না।—সত্য আজ তাহাকে কি প্রশ্ন করিল? ছি ছি, সে ইহার কি উত্তর দিবে? সে তো জানেও না তাহার মন কি উত্তর দিতে পারে। জানে না? সত্যকামের সম্বন্ধে তাহার অন্তর কিছুই কি বলে না? শান্তা জোর করিয়া নিজের কাছে উত্তর দিল,—না!

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "প্রশ্নের জবাব দেবে না?"

শান্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বাভাবিক হাসি মুখে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এ কী রকম প্রশ্ন ভাই?"

সত্য বলিল, "অত্যন্ত সোজা।"

শান্তা মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "অত সোজা নয়।"

সত্যকাম তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সেই সলীল চাহনি, যাহা তাহাকে ক্ষণে ক্ষণেই কাছে টানিয়া আবার পরমুহূর্তেই দূরে ঠেলিয়া ফেলে। এর অর্থ কি?

"তোমার দার্শনিক বুদ্ধি যে তাহলে আমার মতই সূক্ষ্ম দেখ্‌চি! একটা সোজা কথার উত্তর দিতে পারছ না?"

শান্তা ব্যস্ততাসহকারে বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, অনেক রাত হয়েছে। আর বাজে বোকো না।"

"এই যাচ্ছি। কিন্তু জবাব আমার চাই-ই।" বলিয়া সত্যকাম কটাক্ষভরে হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিয়া যাইতেছিল। শান্তা কিছু অন্যমনস্ক। অতসী বলিল, "তোকে তো ভাই আমি আজ অবধি কখনো রূঢ় হতে দেখিনি। তুই যে কারো সঙ্গেই রূঢ় ব্যবহার কর্ত্তে পারিস্, এও আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে।"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও বিশ্বাস করি নে।"

কৌতুকভরে চাহিয়া অতসী জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে ব্যাপারটা কি শুনি?"

"কি করে বল্‌ব ভাই, আমি তো জানি নে।"

অতসী একটু হাসিল। আবার বলিল, "অনেকদিনই মিঃ মিত্র অনেক কিছু কথাবার্ত্তা আমার কাছে বলেন, সেদিনও এসেছিলেন,—বল্লেন —শুন্‌লাম।"

কি কি বলিলেন সে কথা জানিবার জন্য একটিবার শান্তার কৌতূহল হইল, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিল না। অতসীর প্রসঙ্গ তাহার আদৌ পছন্দ হইতেছিল না, প্রশ্নোত্তর করিয়া অযথা কথা বাড়াইবার প্রবৃত্তি নাই। সে চুপ করিয়া রহিল।

অতসী নিজেই বলিল, "অনেক দুঃখ করছিলেন। বল্‌ছিলেন—এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সংগ্রামই শুধু করলাম, শান্তি পেলাম না একটা দিনের তরেও। শুধু তিক্ততা আর রিক্ততা! যারই কাছে উন্মুখ আশা নিয়ে যাই, বিমুখ হয়েই ফিরে আসি।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাঁর দুঃখ কিসে?"

"জানিস্ না?"

শান্তা মাথা নাড়িল।

"পারিবারিক অশান্তি আর কি! বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, মা ভাই বোন্ থেকেও কেউ নেই।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ অপরেশবাবু তাঁদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন—একত্র থাকতে পারছেন না।"

শান্তা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমনটা হল?"

"বুঝতে পারি না। তবে অপরেশবাবুর নিজের মুখ থেকে শুনেছি—তাঁদের গোঁড়া সংস্কারবদ্ধ পরিবারের মধ্যে তাঁর অত্যধিক অ্যাড্‌ভান্‌সড্ আইডিয়াজ্ ঠিক খাপ খাওয়ানো গেল না, প্রতি পদে পদেই বিরোধ! সুতরাং ফলে তাঁকে পরিবারের সম্পর্ক ছাড়তে হল; তা তিনিই নিজে থেকে ছেড়ে আসুন, কিম্বা মা ভাই বোনই ছাড়তে বাধ্য করুন, ঠিক বলতে পাবি নে।"

শান্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ইহার বিন্দুবিসর্গ কোনও খবরই সে জানিত না, জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "আর তাঁর স্ত্রী?"

অতসী হাসিয়া উত্তর দিল, "স্ত্রী কোথায়? বিয়ে তো হয় নি!"

"ওমা!"

"কেন, তুই এও জানতিস্ না নাকি?"

"খোঁজ নিতে তো যাই নি।"

অতসী আবার পরিহাসভরে হাসিল, "একেবারে নির্ব্বিকার ব্রহ্মচারিণী দেখ্‌চি!"

শান্তা উত্তর করিল না।

অতসী বলিল, "অপরেশবাবু একেবারে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় বলেই

বাইরে দশ রকম কাজকর্ম্ম নিয়ে সব সময় এত বেশী ব্যস্ত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ কিনা, অশান্তি ভুলবার জন্যে কোনও রকমে মনটাকে ব্যাপৃত রাখা।"

শান্তা নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিল। বাস্তবিক, দুঃখ মানুষের কত রকমেরই থাকে! সত্য বটে, অপরেশবাবুকে তাহার একেবারেই ভাল লাগে না, কাছে আসিলে, কথা বলিলে মন যেন তাহার অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তবু তাঁহার দুঃখও তো দুঃখ বটে! তাঁহারও তো মানুষের হৃদয়! শান্তা একটুখানি বেদনা অনুভব না করিয়া পারিল না। বলিল, "সত্যি ভাই, দুঃখেরই কথা। আমি তো এর কিছুই জান্তাম না আগে।"

"জান্‌লে কি করতিস্?"

"করতাম আর কি? ছাখ্ ভাই, জগতে দুঃখ এত বেশী অথচ দূর করবার সাধ্য আমাদের এত কম!"

অতসী দার্শনিক দুঃখতত্ত্বনিরূপণের কাছ দিয়া আদৌ গেল না। অর্থভরা চাহনি ও হাসি মিলাইয়া বলিল, "সাধ্য কম নাকি তোব? আমার বিশ্বাস, মিঃ মিত্র ঠিক তার উল্টোটাই মনে করেন—অন্ততঃ তাঁর নিজের বিষয়ে।"

শান্তার রাগ হইল। বার বার এই পরিহাস তাহার পছন্দ হইল না। সে বলিল, "মিঃ মিত্র কি মনে করেন বা না করেন, সে বিষয়ে তোমাকে তাঁর মুখপাত্র নিযুক্ত করেছেন নাকি?"

অতসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। "না রে না, মুখে বল্‌বার কথা হলে তো মুখপাত্র? এ তাঁর একান্ত মনের কথা যে! তবে দুদিকেই বহুদিনের ঘনিষ্ঠতার দরুণ আমি একটু একটু বুঝতে পারি।"

শান্তা নির্ব্বিকার কণ্ঠে বলিল, "তাহলে বুঝতে থাক তোমার যত খুসী! আমাকে বলার তো দরকার নেই!"

অতসী হাসিয়া বলিল, "থাক্ তবে !"

সন্ধ্যাবেলা অতসী বিদায় লইলে শান্তা চুল বাঁধিতে বসিল। মনটা বড় বিশ্রী হইয়া আছে। অপরেশের সম্বন্ধে কখনও সে বড় একটা ভাবনা করে নাই, তাহাকে চিন্তার অপব্যয় বলিয়াই মনে হয় যেন। আজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রসঙ্গ মনে আসিয়া বিরক্ত করিতেছে। অতসীর ঐ পরিহাসভরা ইঙ্গিত যতবারই মনে হয়, ততই অপ্রীতিতে মন ভরিয়া উঠিতে চায়। ছিঃ, বিশ্রী ! অপরেশের প্রতি বিরূপ মনটা আরও কঠোর হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ছবিটি ! অতসী আজ প্রসঙ্গক্রমে যাহা উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, তাহা তো কখনও সে জানে নাই। অপরেশের বাহিরের আচরণ ও আবরণের পশ্চাতে কতখানি দুঃখচ্ছায়া জমা হইয়া আঁধার করিয়া আছে, কে জানে ! চট্ করিয়া শান্তার মনে পড়িয়া গেল, অপরেশ কবে যেন তাহাকে বলিতেছিলেন—তাঁহার এই শ্রান্তজীবনে একটু স্নেহসবস বিশ্রাম মিলিলে তিনি বাঁচিতেন। তখন তাহার অর্থটি সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, আজ পারিল।

কিন্তু পারিয়াই বা কি হইবে ?

কতগুলি অপ্রীতিকর অনুভূতি মনের মধ্যে এলোমেলোভাবে মাথা জাগাইয়া শান্তাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এত ভাবনা কেন আসে ? প্রয়োজন কি ? সংসারে থাকিয়াও চিরদিন সংসার হইতে সে দূরে সরিয়াই আছে, ইচ্ছা করিয়াই নিজের মনটাকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টার তো অবধি নাই, তবু কেন ইহার সংস্পর্শের আঘাত হইতে মনকে বাঁচাইতে পারে না ? আঘাত তাহাকে মানুষে দিতে আসে কেন ? সে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করে না, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যেরই বা কি কাজ ? ভারি অন্যায় !

সত্যকাম ঘরে আসিল।—"কি, চুপ্‌টি করে বসে যে ?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "এমনিই।"

অপ্রসন্নতা পাৎলা হইয়া মন যেন কতকটা খুসী হইয়া উঠিল। চুলোয় যাক্ যত সব অবান্তর বাজে কথা! সে সোজা হইয়া ফিরিয়া বলিল, "বোস।"

"অনুমতি না দিলেও জোর করে বস্তাম।"

"সে তুমি পারো জানি।"

কৌতুকভরে সত্য বলিল, "তাতে তুমি দোষ নাও না নিশ্চয়ই—সেটুকু অধিকার আছে বোধ হয় আমার?"

স্নিগ্ধ হাস্যে শান্তা উত্তর করিল, "গায়ের জোরে দখল করলে বাধা দেয় সাধ্য কার?"

"তবু একবারটি মুখ ফুটে 'হাঁ' বলবে না! কি শক্ত মেয়ে তুমি!"

"'হাঁ' আর 'না'—দুটো বড্ড সংক্ষিপ্ত জবাব! ওতে গল্প ভালো জমে না। না ভাই? সব কথা অত সংক্ষেপে সেরে ফেলব, তাই চাও নাকি? তাহলে বল।"

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া সত্যকাম বলিল, "নমস্কার তোমার রসনাকে! যাক্, আমি হার মান্লাম।"

উচ্ছ্বসিত স্রোতে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজে গল্প চলিল। শান্তার মনের মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। সত্যই সত্যকামের আবির্ভাবের একটা ঐন্দ্রজালিক মাধুর্য্য আছে। শান্তা মনে মনে স্বীকার করে, ইহাকে ভাল না বাসিয়া পারাই যায় না। সুন্দর!

জানালার গরাদে কোথা হইতে একটা সবুজ রঙের পাখী আসিয়া উড়িয়া বসিল। টেবিলেব উপরে সত্যকামের হাতের কাছে ছিল এক টুক্‌রা কাগজ। গল্প করিতে করিতে সেখানা হাতে মুচ্ড়াইয়া গোল পাকাইয়া তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। পাখী উড়িয়া পলাইল।

শান্তা সস্নেহ ধমক্ দিয়া বলিল, "ওকি হল? ভারি চঞ্চল তুমি! একটা সামান্য সৌন্দর্য্যজ্ঞানও নেই!"

সত্য ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কেন, ওটি রাজকন্যার সোণার পাখী নাকি? রাজপুত্রের বার্ত্তা বয়ে আন্‌ছিল?"

"অসম্ভব কি?"

"ও, তাই বল। তাহলে আমার নেহাৎ অন্যায় হয়ে গেছে!"

মুহূর্ত্ত কয়েক দুইজনেই চুপ করিল।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে উত্তর দিলে না তো?"

"কিসের উত্তর?"

"ভুলে গেছ?"

"মনে পড়ছে না তো!"

সত্যকাম বক্রোক্তি করিয়া বলিল, "মনে খুব ভালোই পড়চে, আমি জানি। বল্‌বে না তাই বল?"

হাসিযা শান্তা বলিল, "ভারি বিপদ্ তো।"

সত্যকাম গম্ভীব হইয়া বলিল, "আবার রিপিট্ করব? তাহলে উত্তর দেবে?"

শান্তার বুকের মধ্যে আশঙ্কা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

সত্য বলিল, "শোনা তবে।—আমি তোমার বিশ্বপ্রেমের সীমানার বাইরে না ভেতরে? শুধু এই একটি কথা!"

কথা একটি! কিন্তু তাহার মধ্যেই যে সবখানি। শান্তা বিচলিত হইয়া উঠিল। বারবার তাহাকে এ প্রশ্ন কেন? তাহার রক্তিম মুখখানা গম্ভীর হইল। ভৎর্সনাভরা দুইটি চক্ষু সত্যকামের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আবার!"

সত্যকাম এই মুখব্যঞ্জনার অর্থ বুঝিতে পারিলনা, আশাও করে নাই। সে মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাপ করো! আর কখনো এ প্রশ্ন করবনা।"

শান্তা চুপ করিয়া রহিল।

সত্য চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ঐ মুখখানা কি বুঝাইতে চায়? তাহার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কপোল দুইখানি যে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তার পরক্ষণেই সে কান্তি মিলাইযা গিয়া ঐ মৌন তিরস্কারের সামঞ্জস্য কোথায়? এক একবার সলাজ প্রেম, আবার প্রাণহীন কঠোরতা!

শান্তার বুকের মধ্যে হিল্লোল উঠিয়াছে। ছোট্ট তাহার মানসতরীখানি একাকী প্রাণপণ বলে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া সহস্র ঘাতপ্রতিঘাত বাঁচাইয়া বহিয়া চলিতেছিল, এবার বার বার সত্যকামের প্রেমের দোলা লাগিতে লাগিতে সে হাল ঠিক রাখিতে পারিবে তো? বড় যে শঙ্কা হয়। অবিরত ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে, তরীখানি নাচিয়া নাচিয়া উঠে। নৌকার মুখ বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে চায়, স্রোত বড় প্রবল! সত্যকাম কেন এমন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে? করে যদি, সে নিজে বা কেন তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেছেনা? কেন পারেনা? শান্তার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ পুলকের প্রবাহ স্পন্দিত হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া অপূর্ব্ব আবেশে আপনার সমস্ত অনুভূতিটুকু পান করিল।

হঠাৎ তাহার চেতনা হইল। ছি, ছি, ছি! সে কি নিজেকে ভুলিয়া গেল নাকি? এই দুর্ব্বলতা!!

মৌনভঙ্গ করিয়া শান্তা সত্যকে বলিল, "বাইরে বেড়াতে যাবেনা?"

তিনদিন ধরিয়া সত্যকাম অবিরত ভাবিতেছে। মাথার মধ্যে সহস্র রকমের এলোমেলো কল্পনা ও চিন্তা, বুকের মধ্যে প্রবল ঝড়। এমন সংশয়ের দোলায় আর তো দুলিতে পারা যায়না। এমন আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব দিনরাত্রি কেন? শান্তা স্পষ্ট করিয়া কি কোনও কথা বলিতে পারেনা? অনেকদিন সে এমন ছেলেখেলা সহ্য করিয়াছে, আর পারিবেনা। তাহার তো একটা মানুষের হৃদয়! শান্তার হৃদয়ের চেয়ে ইহার মূল্য কি কম? তাহার এই হৃদয়খানি তরুণ তাজা রক্তরাগ দিয়া যে প্রেমপদ্মের অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে, তাহা শান্তা যদি গ্রহণ না করে, বেশ তো, সেকথা বলেনা কেন সে? তাহাতে যদি তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া রক্ত ঝরে ঝরুক্। শান্তার তাহাতে কি? যেমন করিয়া পারে সত্যকাম একলা তাহার জর্জ্জর জীবনের ভার বহন করিবে, শান্তাকে তো ভর্ৎসনা করিতে আসিবেনা! তবে সে জবাব দেয়না কেন? সত্যকাম মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

আর যদি—যদি শান্তা—! কল্পনার আনন্দে সে অর্দ্ধপথেই শিহরিয়া উঠিল। সে কি অসম্ভব? একেবারেই? কতদিন সে যে দেখিয়াছে, তাহার আগমনে শান্তার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কতদিন তাহার প্রেমনিবেদনের আভাসমাত্রে শান্তা লজ্জারুণ মুখখানি প্রাণপণে লুকাইবার ব্যর্থ যত্ন করিয়াছে। সে কি তাহা দেখে নাই?

অনেকক্ষণ ধরিয়া সত্যকাম নিজের ঘরখানার এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া থামিল। ব্যস্, ঠিক! এই ঠিক হইয়াছে। এবার সুস্পষ্ট প্রশ্ন, আর তাহার সুস্পষ্ট উত্তর। ভীরুমনের সকল সঙ্কোচ

কাটাইয়া আজ সে তাহার পুরুষের বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রবল ইচ্ছাশক্তি লইয়া শান্তার সম্মুখে দাঁড়াইবে। আজ ?—হাঁ, আজই।

—শান্তা এখন কি করিতেছে ? কিছুই না হয়ত। হয়ত ঘুমাইয়া আছে, বই পড়িতেছে হয়ত, হয়ত অন্যমনে জানালার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেই বা।—কি ভাবিতেছে ?

প্রিয়লালবাবু এখন ?—কলেজে।

সুষমা, ইন্দুমতী ?—ঘুমাইয়া আছেন নিশ্চয়ই।

সত্যকাম ঘর হইতে বাহির হইল। যাইবে সে ? আজই ? এখনই ? —পা দুইখানি আবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

আর একবার বিচারের অবকাশ লওয়া ভাল। আর একটা দিন—আর কয়টা ঘণ্টা ? আর একটু ক্ষণ ? উত্তেজনার প্রবল আবেগে এইখানে একলা সে যাহা সংকল্প করিতেছে, যে কথা বলিবে বলিয়া পণ করিয়াছে, শান্তার মুখোমুখি হইয়া তাহা যদি এলোমেলো হইয়া যায় ? কি যেন শক্তি আছে ঐ দৃষ্টির তলায়, যাহা তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে।

কেবলই দ্বিধা আর সঙ্কোচ ! ভয় আর ভাবনা ! সত্যকাম ভাবে, একি দুর্ব্বলতা ! এ তাহার সাজেনা। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। এমন আড়ষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে কেন ?

দুই হাতে সাহস সঞ্চয় করিয়া সত্য চলিয়া আসিল।

শান্তা তখন প্রিয়বাবুর পাঠাগারে। কোলের উপর একখানা বই খুলিয়া ধরিয়া টেবিলের উপরে মাথাটা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া আছে। মগজের মধ্যে তখন পুস্তকের অক্ষরগুলি, না অবান্তর ভাবনা, না স্বপ্নালস তন্দ্রা, বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই।

সত্যকাম কাছে আসিয়া সশব্দে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, "পড়া হচ্ছে, না, ঘুম ?"

চকিত হইয়া শান্তা মাথা তুলিল, "ছুটোর একটাও না।" তাহার বুকের মধ্যে কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

"বইখানা খুলে রাখার তাহলে উদ্দেশ্য? সবাই বলবে ভারী বিদুষী মেয়ে, না?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "তা ছাড়া আর কি? প্রশংসা কে না চায় বল?"

"ভারি কপট! অন্তরে বাইরে তোমার দিনরাত তফাৎ!"

"কি করব, ওই আমার স্বভাব!"

সত্য টিপ্পনীর স্বরে বলিল, "সে কি আর আমার জানা নেই? সবতাতেই—" অপর পক্ষ হইতে বাধা না পাইযাও সত্য থামিয়া গেল।

শান্তা বলিল, "লিষ্টি বলে যাও।—"

সত্যকাম হাসিল।

অনাদৃত বইখানাকে টেবিলের উপর তুলিযা শান্তা পাতা উল্টাইল।

"ওকি, তুমি শুন্‌চনা! বলবনা তবে—"

"কী বা বলবে আর কী বা শুন্‌ব?"

"বল্‌বার অনেক কিছুই থাকে, কিন্তু ফুরসৎ দাও কই?"

শান্তা সহাস্যবিস্ময়ে বলিল, "বল কি! আমার মত অনুগত শ্রোতা আর কোথাও দেখেচ? তোমার যা খুসী অনর্গল তো বকে যাচ্ছ, আমি কথাটি না বলে বেমালুম সব হজম করে যাচ্ছি। আর কি চাও?"

মাথাটা একটু দোলাইযা সত্য বলিল, "তা বটে!" ঠোঁটের কোণে একটুখানি স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, "আচ্ছা বেশ, আজ যা বলব সেটাও শুনবে নিশ্চয় তাহলে? কেমন, আপত্তি নেই তো?"

শান্তা ভয় পাইল। উত্তর দিবার আগে মুহূর্ত্ত কয়েক সশঙ্কনেত্রে সত্যকামের দিকে চাহিয়া দেখিল।

সত্য মৃদুহাস্যে বলিল, "তোমার নামে একটা কথা শুনেচি, জানো? —সত্যি উত্তর দেবে?"

একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া শান্তা বলিল, "কি শুনি?"

মুহূর্ত্তকয়েক ইতস্ততঃ।

"শুন্‌ছিলাম, তুমি নাকি বিয়ে করবেনা বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছ?—"

হাসিয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় শোন এ সব?"

"শুন্তে পাই রিলায়েবল্ সোর্স থেকেই।"

"ভালো।"

"কেন করবেনা জান্তে পারি?"

শান্তা একটু হাসিয়া বলিল, "বিপদ তো মন্দ নয়! তুমি আবার অভিভাবকত্ব সুরু করলে নাকি?"

"না, না, সত্যি! বল না?"

"বাজে কথা নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন?"

সত্য মিনতির সুরে বলিল, "আব কখনও তোমার কোনও বিষয়ে কৌতূহল দেখিয়েচি কি? কিন্তু আজকের এটা বল্‌তেই হবে। শুধু দুটো কথা—বিয়ে করবেনা, একি সত্যি? কেন করবেনা?"

"তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

"কৈফিয়ৎ নাই বা দিলে, জান্তে দিতে ক্ষতি কি?"

শান্তা অস্বস্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। প্রসঙ্গটিকে চাপা দিবার মত একটি সদুত্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার আগেই সত্যকাম আবার বলিল, "ঐ একটা কথা জান্তে দিতে তোমার ক্ষতি কিছুই নেই, আমার লাভক্ষতি আছে অনেকখানি।"

কথাটা শান্তার কানে বড় বিসদৃশ হইয়া বাজিল। সে বিবাহ করে কি নাই করে, তাহাতে সত্যকামের ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

সত্য বলিল, "বিশ্বাস করচনা ?"

"কি ?"

সত্যকাম চুপ করিয়া রহিল। অজানা আশঙ্কায় শান্তার মন ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ মাথা তুলিয়া অনুনয়ভরে সত্য বলিয়া ফেলিল, "সত্যি করে বলোনা শান্তা, তুমি কি আমায় আজও বুঝতে পারো নি ?"

সত্যকামের কণ্ঠস্বরের কম্পনটুকু শান্তার দেহসুদ্ধ যেন কাঁপাইয়া তুলিল। কি বুঝিবে-সে, কী ? কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন কেন ?

না বুঝিয়া না ভাবিয়া সে উত্তর দিয়া ফেলিল, "জানি না।"

"জানোনা ? এত অবোধ তুমি কবে থেকে হলে শান্তা ? দর্শনের সব জটিল তত্ত্ব দিনরাত তোমার মাথায খেলে, অথচ এত কাছাকাছি যে মানুষটির সব কিছু প্রত্যক্ষ করচ, তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাটুকু বুঝতে পারো না ?"

শান্তার মাথায় বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইল। হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন এ ঝলকে মুখের মধ্যে ছুটিয়া আসিল—মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিতেও সে ভুলিল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, সেখানে কী ? সত্যকাম চাহিয়া দেখিল—ঐ সুগৌর মুখখানিতে কি অপূর্ব্ব রক্তিমা বসোরা গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ লজ্জারুণ অধর দুইটি! উদ্যত আবেগে নিমেষের জন্য তাহার দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শান্তা নত চক্ষু দুইটি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সত্য থামিয়া গেল। অধীর আগ্রহে বুকে চাপিয়া বলিল, "জানো শান্তা"—"

বাধা দিয়া শান্তা বলিল, "না জানিনা—বোলোনা।"

"বলতে আমার হবে,—বলব।"

সভয়ে শান্তা বলিল, "না—না।"

সত্যকাম চেয়ারখানার উপরে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া গভীর-ভাবে বলিল, "বল্‌তে বাধা কেন দাও? আমি বল্‌বই, তোমার ভালো না লাগে, শুনোনা।—তুমি জানোনা, আমার সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এক-মিনিটও তোমার কথা না ভেবে পারিনা।—বিশ্বাস হচ্ছেনা? সত্যি তাই। কিন্তু কেন যে এমন হয়, আমি নিজেও বুঝতে পারিনা। তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো?"

একটুমাত্র থামিয়া আবার বলিয়া চলিল, "বাইরে থেকে কেউ আমার ভেতরকার এ ভয়ানক অবস্থাটা জান্তে পাবেনি, জান্‌বার অবকাশ আমি দিইনে। কিন্তু তা বলে তুমিও যে বুঝতে পারবেনা, এ আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনা। তুমি একটুও কি অনুভব কর্ত্তে পারচনা শান্তা? আমি যে তোমাকে—আমি—"

শান্তার রক্তিম মুখমণ্ডল কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিনতি, কঠোরতা ও আদেশ মিশানো স্বরে বলিল, "থামো সত্যকাম।"

কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

'আহত সত্যকামের গভীর লুব্ধদৃষ্টি একাগ্রভাবে তাহার অনুসরণ করিল —বুঝিতে পারিল না তাহার হৃদয়ের মধ্যে কী প্রচণ্ড আলোড়ন উঠিয়াছে। সে ক্ষুব্ধ অভিমান ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

* * * * *

বসিবার ঘরের নিরালা কোণটিতে শান্তা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভাবিবার যেন সামর্থ্য নাই।

একি হইল? তাহার মনের জমা তুহিন আজ কাঠিন্যের বাঁধ ভাঙিয়া প্রেমের বন্যায় উছলিয়া উঠিতে চায় যে! তাহার ধ্যানমৌন সমাধিক্ষেত্র আজ একেবারে কোকিলের ললিত ঝঙ্কারে মুখরিত হইল যে! সর্ব্বাবয়বে পুলকের ঢেউ জাগিয়াছে। চারিদিকের আকাশে বাতাসে উন্মাদকর মদিরগন্ধ—যেন সত্যকামের দেহ সৌরভ! বাতাস তাহার গায়ের উপর দিয়া গাঢ় স্পর্শ বুলাইয়া যাইতেছে—যেন সত্যকামের ভরা যৌবনের আলিঙ্গনের মত। শান্তা শিহরিয়া উঠিল। উঃ! একি অবস্থা তাহার? এমন মারাত্মক আনন্দের আঘাত আজ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তাহার বুকে বাজিল?

কিন্তু এ তো আজ হঠাৎ আসে নাই! বহুদিন ধরিয়া তিলে তিলে এ যে তাহার বুকের কোণে জমা হইয়া উঠিতেছিল। সে জোর করিয়া চক্ষু মুদিয়া ছিল, দেখিয়াও দেখে নাই, জানিয়াও স্বীকার করে নাই। কিন্তু আজ স্বীকার না করিয়া উপায় কি? সত্যকামের হৃদয় হইতে যে অদৃশ্য ক্ষীণ ধারাটুকু ঝর্ণার মত তাহার চারিদিকে নাচিয়া ফিরিতেছিল, সে তাহাকে বাধা দেয় নাই, বরঞ্চ আগ্রহে তাহাতে স্নান করিয়া আপনি স্নিগ্ধ হইবার সাধ করিয়াছে। আজ সেই সুধার ধারাটুকু সুরাসমুদ্রে ফেনায়িত হইয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে চায়, এখন ইহাকে রোধ করিবার সাধ্য তাহার কোথায়? আগ্রহই বা কই?

অপূর্ব্ব পুলকের আবেগে শান্তা ভাবিল, রোধ করিবার প্রয়োজনই বা কি?

বুকটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল, মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। প্রয়োজন?—হুঁ। প্রয়োজন কিছু আছে বৈ কি? নহিলে সে এতদিন কেন সযত্নে নিজেকে সকল আকর্ষণ হইতে বাঁচাইয়া আসিয়াছে? সে যদি হৃদয়ের উপর সতর্ক পাহারা না রাখিত, তবে এতদিনে কোন কালেই তাহার

স্নেহপ্রবণ প্রাণখানি সত্যকামের কামনার উত্তাপে গলিয়া হিল্লোল তুলিয়া তাহার পায়ের তলে লুটাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। সে তো তাহা করে নাই!—কিন্তু কেন করে নাই? এই যে তাহার অন্তরটা আজ অব্যক্ত পুলকে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, ইহাকে স্বীকার করিতে ক্ষতি কি? ওই যে সত্যকামের মিলনব্যগ্র বক্ষখানি তাহারই জন্য উন্মুক্ত ও উন্মুখ হইয়া আছে, তাহাতে ধরা দিবার জন্য অধীর আগ্রহ জাগিয়া উঠা সত্ত্বেও এত কুণ্ঠা কেন?

শান্তার দর্শন গা ঝাড়া দিয়া মাথা তুলিল।—হুঁ, প্রণয়ের যে স্বাভাবিক পরিণতি পরিণয়ে, তাহা যে তাহার জন্য নয়। তাই তো! বিবাহের বন্ধন সে তো স্বীকার করিতে পারিবে না। ভালোবাসিতে সে পারে, ভালোবাসিবার জন্য সে ব্যগ্র, ভালোবাসা তাহার কাছে স্বর্গসম্পদ্। কিন্তু পুরুষ নারীর প্রেম যখন কামনায় রঙীন হইয়া উঠে, তখন তাহা একান্ত স্থূল হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের করিতে হয় বিবাহ। কিন্তু বিবাহই যেখানে অসম্ভব, সেখানে এ রঙীণ প্রেমকে সে প্রশ্রয় দিবে কেমন করিয়া? তাই তো, এইখানেই যে তাহার অন্তরায়। ভালোবাসার এই বীজটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ না করিয়া আপনার প্রাণের রসধারা দিয়া আদরে সোহাগে লালিত বর্দ্ধিত করিবার ফলে যেদিন তাহা পুষ্পফলে বিচিত্রিত মহাদ্রুম হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা অন্যায়। তখন তাহা বিশ্বাসঘাতকতা। এই আশঙ্কায়ই তো সে এতদিন প্রাণপণে সত্যকামের ভালোবাসার সকল আক্রমণকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল। আজ তাহার প্রাণের সমস্ত কমনীয় অনুভূতি বুকের কাছে আসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কিন্তু সত্যকামের কাছে তাহা কি প্রকাশ করা চলে? সত্যকাম তাহার মুখ হইতে শুধু একটিমাত্র প্রাণের কথা শুনিতে চায়— সে তাহাকে ভালোবাসে কি না। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কি সে দিতে

পারে ? সে যদি আজ স্বীকার করিয়া ফেলে, তবে শুধু সেই স্বীকারোক্তি-টুকু লইয়াই কি সত্যকাম সন্তুষ্ট হইবে ? ওটুকু তো তাহার প্রণয়-যাত্রা-পথের প্রথম পাথেয়। ঐ প্রথম জয়ের গর্ব্ব ও আশা লইয়া তাহার দাবী ব্যাপকতর, গভীরতর, স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে যে ! মানব-মনের এই-ই ধর্ম্ম। তাই তো দ্বিধা, তাই তো বাধা। সত্যকামের চরম দাবী সে যে পূর্ণ করিতে পারিবে না।

পারিবে না ?

না। তাহার জীবনের সামনে যে মহিমময় সুকঠোর আদর্শ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, তাহা বাধা পাইবে। সমস্ত বিশ্বমানবের মধ্যে তাহার যে অব্যাহত কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে একটিমাত্র মানবজীবনের সঙ্গে নিজেকে গাঁথিয়া রাখিতে সে চায় না। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও সমপ্রেম বিলাইয়া দিয়া বিশ্বজগৎকে সুখী করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, বিবাহিত জীবনের স্বার্থমগ্ন আনন্দের তলায় চাপা পড়িয়া সে আকাঙ্ক্ষা যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার অন্যায়। দেহের প্রবৃত্তিকে অবাধে চরিতার্থ হইবার অবকাশ দিয়া তাহার উর্দ্ধমুখী আত্মাকে যে খর্ব্ব করিয়া মাটির পানে টানিয়া আনা হইবে, তাহার মানবাত্মার এ অপমান সে সহিতে পারিবে না। অন্যে মনে করিতে পারে, মানুষ শুধুই দেহপিণ্ড ; কেহ মনে করিতে পারে, দেহ ও মনের তুল্য সমবায় ; সে মনে করে, দেহের উপর আত্মার প্রাধান্যই মানবত্ব। ইহাকে সে অবনত হইতে দিবে না।

কিন্তু পরিণয়ে মানবত্ব খর্ব্ব হয় কি ?

হয়—হইবে—তাহার পক্ষে। সংশয়ে দুলিয়া শান্তা ভাবিতে লাগিল।

না—ও যদি হয়, তবু সে পারে না। উঁহু, পারেই না। সে যে আজীবন কুমারীব্রত স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে। গুরুজনগণ তাহাকে

চিরাচরিত প্রথায় পরিণীত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, সে প্রতিরোধ করিয়াছে। কেন করিল? তাইত—কেন? হয়ত বা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।—হউক ভুল, তব্ তো সে করিযাছে, এ দাযিত্ব তো ফিরাইবার নয। তাহাব সংকল্প ব্যর্থ হইতে পাবে না তো! গুরুজনদের ক্ষুণ্ণ, ব্যথিত, রুষ্ট করিযা সে যে নিজের লক্ষ্যে মাথা তুলিযা দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাহার অন্তরদেবতারই অনুপ্রাণনায। যদি সে অনুপ্রাণনা মিথ্যা হইয়া থাকে, দেবতা যদি তাহায় সহিত পরিহাস করিযা থাকেন, তবেই বা উপায কি? সে পরিহাসের কাঁটা আজীবন তাহাকে বুকে বিঁধিযা চলিতেই হইবে। আর কোনও অন্তরায নাই থাক্, শুধু ঐ একটিমাত্র সংকল্পের সত্যরক্ষার জন্যই পরিণযের পাশ হইতে মুক্ত থাকা তাহার চাই-ই। সত্যকামের প্রণযকে দূরে ঠেলিতে হইবে।

—ঠেলিতেই হইবে?

বেদনায় বুকের ভিতরটা মোচড় খাইল। বড় যে কঠিন! ঐ যে সত্যকামের সুরঝঙ্কার এখনও আসিযা মর্ম্মে পশে, সত্যকামের নয়নের আলো তাহার সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত করে!

২৭

যুযুৎসু শিক্ষার বইখানা অনেকক্ষণ উল্টাইয়া ছবি দেখিয়া শান্তা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "তোর তাহলে একেবারে সবটা শেখা হয়ে গেল ?"

অতসী বলিল, "সবটা নয়—অনেকটা। যাঁর কাছে শিখছি, তিনি বলছিলেন, যুযুৎসু বিদ্যেটাকে পারফেক্‌ট্‌লি মাষ্টার কর্ত্তে পেরেছে শুধু গুটি পাঁচেক লোক, আর সবাই তার কাছেও এগোতে পারেনি, দুতিনটে স্তর পেরিয়েছে মাত্র।"

"ভারি শক্ত, না ভাই ?"

"প্রথম প্রথম তেমন কিছু নয়—"

"আমাকে এবার শিখিয়ে দিবি ?"

অতসী বলিল, "সবুর কর্ কিছুদিন। এখনও শেখাতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।"

দ্বারপ্রান্তে অপরেশ মিত্র দেখা দিলেন। অতর্কিতে তাঁহার পায়ের গতি থমকিয়া দাঁড়াইল।

অতসী আহ্বান করিল, "আসুন মিঃ মিত্র।"

ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীরে তরুণী যুগলকে অভিবাদন জানাইয়া অপরেশ বলিলেন, "আপনার এখন সময় হবে কি, মিস্ চৌধুরী ?"

"হবে বৈকি, সেই অ্যাকাউন্ট্‌স্‌গুলো বুঝি ?—"

বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট হইতে খানকতক কাগজ পত্র নামাইয়া অপরেশ অতসীর সামনে রাখিলেন।

"ভালোই হল, শান্তাও রয়েচে। এক সঙ্গেই সব দেখে দিতে পারব।"

অপরেশ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "হুঁ।"

শান্তা ততক্ষণে আবার যুযুৎসুর বইখানিতে মনসংযোগ করিয়াছে।

অপরেশ ও অতসী অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ অতসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা একটু বসুন, আমি আস্‌ছি।"

অতসী বলিল, "বোস্ ভাই, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি। অ্যাকাউণ্ট্‌গুলো ততক্ষণ দেখে দে। ওঃ, ভালো কথা মিঃ মিত্র, শান্তা বলছিলেন যুযুৎসু শেখবার কথা।" হাসিয়া বলিল, "ওঁর কাছ থেকে ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্ নিতে পারিস্ শান্তা, উনি আমার চেয়ে অনেক বেশী অ্যাড্‌ভান্‌স্‌ড্।"

শান্তা বা অপরেশ—কাহারও কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অতসী চলিয়া গেল।

শান্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওগুলো মিস্ চৌধুরীকে নিয়েই ঠিক করে ফেলতে পার্বেন না? না, আমার কাছ থেকে দরকার আছে কিছু?"

অপরেশ ফাউণ্টেন্‌পেন্‌টির গোড়াটা চিবুকে ঠেকাইয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন,—"না, দরকার কিছু নেই।"

শান্তা প্রস্থানের উপক্রম করিল।

অপরেশ এইবার মুখ তুলিয়া প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলেন, "দরকার কিছু নেই। তবে বিনা দরকারেও কেন আপনাকে কাছে চাই, সেই কথাটা বল্‌বার সুযোগ পেলে ভালো হত। পাঁচ মিনিট্ ওয়েট্ করবেন কাইণ্ডলি?"

অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য যেটুকু বা শান্তার ছিল, এই ভূমিকা মাত্রেই তাহা টুটিল। অস্বস্তিভরে বলিল, "দেখুন, আপনি কাজের লোক, অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করা আপনার শোভা পায় না; তা ছাড়া, আমারও সময়ের মূল্য আছে।"

ঠোঁটের কোণে ম্লান একটু হাসি ফুটাইয়া অপরেশ বলিলেন, "সে আমি জানি। নিজের সময়ের জন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু আপনার অমূল্য ক্ষণগুলো যে নষ্ট করি, সেজন্যে সত্যি আমি আন্তরিক দুঃখিত—বিলিভ্ মি। কিন্তু না করে উপায় নেই। একটা সম্পূর্ণ জীবন যখন ধ্বংস হবার উপক্রম হয়—যতই অপদার্থ হোক্ সে জীবন —তখন বাঁচ্‌বার জন্যে আর একটা জীবন থেকে দু'চারটে মুহূর্ত্ত অধিকার কর্লে অন্যায় হয় না, এই ধারণা আমার আছে বলেই ডেয়ার করি।"

শান্তা স্তম্ভিত, নিরুত্তর।

"বেশীক্ষণ আপনাকে ডিটেন্ করে রাখবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। শুধু একটিবার আমায় নিজেকে এক্‌স্‌প্রেন্ করবাব অপারচুনিটি দিন্।—যদি জান্তেন আমার এ সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস!" একটা উষ্ণনিশ্বাস পড়িল।

শান্তা অবাক্ হইয়া অপরেশের বেদনাহত মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিল। বিরক্তি, অশ্রদ্ধা ও অপ্রসন্নতার আঁধার জমিয়া মনের কোণটা যেখানে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল, সেখানে সমবেদনার অরুণ আভার ছাপ লাগিয়া গোধূলিব মত বিচিত্র হইয়া উঠিল।

অপরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন একটু সময ?"

"কি বলবার আছে বলে ফেলুন। অনর্থক সময় নষ্ট করচেন।"

এই প্রত্যুত্তর? একি হিসাবের যোগবিয়োগ যে এক নিমেষে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াই শেষ হয়,—না, ইহা বলিয়া ফেলা যায়? একটা মানুষের জটিল সমস্যা, অব্যক্ত অনুভূতি, দুর্জ্ঞেয় হৃদয়! খুলিয়া ধরা এতই কি সহজ?—অপরেশ চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে সর্ব্বাঙ্গের ভার এলাইয়া দিয়া ক্ষোভে মৌন হইয়া রহিলেন।

বিরাগে ও বেদনায়, ক্রোধে ও সৌজন্যবোধে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শান্তা ক্রমাগত অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

"শান্তা!"

একি অভিনব সম্ভাষণ! শান্তা আতঙ্কে চাহিল।

গাঢ়স্বরে অপরেশ বলিলেন, "শান্তা, তোমায় যদি কাছে পেতে ভালোবাসি, সে কি আমার এতই অপরাধ?"

শান্তার ললাটখানি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এতখানি ধৃষ্টতা সে নীরবে সহ্য করিতেছে কেন? সৌজন্য যথেষ্ট দেখানো হইয়াছে, আর শিষ্টাচার ভালো নয়। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াও অন্যায়। বুকের ভিতর হইতে অজানিতে কে খোঁচা দিয়া উঠিল। অন্যায়? কি অন্যায়? এই ভালোবাসা? তবে—সত্যকাম—? তাইত! সত্যকামের ব্যাকুলতা তাহার কুমারীবুকে যে মলয়ের স্পর্শ মাখাইয়া দেয়, অপরেশের প্রেম অপরাধ কেন?

থাক্, অত সূক্ষ্ম মানদণ্ডের বিচারে কাজ নাই। অপরেশের প্রেম তাহাকে পীড়া দেয়, তাহাকে সে সহিতে পারে না, এই যথেষ্ট। তাঁহার বাসনাদীপ্ত উষ্ণনিশ্বাস তাহাকে অপবিত্র করিয়া তোলে। ইহা যেন আর অগ্রসর হইতে না পারে।

শান্তা কঠিনস্বরে বলিল, "আমার অভদ্রতা মাপ কর্ব্বেন। কিন্তু আমারও ধৈর্য্যের সীমা আছে।"

অপরেশের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া কালো হইয়া উঠিল; পুনরুক্তি করিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও ধৈর্য্যের সীমা আছে। এমন ব্যর্থতা আর ব্যথার বোঝা বুকে নিয়ে তার ওপরে দুঃসহ প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য কর্ত্তে আমি ছাড়া কেউ পারত না। তবু আমারও ধৈর্য্যের সীমা আছে।"

শান্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে দেখিল, অপরেশ প্রাণপণে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিয়া কম্পনবেগ রোধ করিতেছেন। কপালের মাঝখানে যে শিরাটি অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার রক্ত-চাঞ্চল্য শান্ত করিবার জন্যই যেন বামহাতখানি অস্থির-গতিতে একবার কপালে একবার কোঁকড়ানো চুলগুলির মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছে।

ভাবিবার অবসর হইল না। অতসীর কাছে কোনমতে বিদায় লইয়া অশান্তমনে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

"এতক্ষণে ফিরলেন, শান্তাদি ?"

"ওমা, বারীন যে !"

বারীন্দ্র স্মিতমুখে বলিল, "এক্ষুণি আমি ফিরে যাচ্ছিলাম আর কি !"

"ফিরবে কেন ? বোস ভাই।"

মনের মধ্যে শান্তার কাঁটা বিঁধিতেছিল ; অলক্ষ্যে তাহাতে ফুলের হাসি দেখা দিল।

জানালার পাশে ফুরফুরে হাওয়ায় বসিয়া বারীনের মনে কবিতা জাগিল।—"আচ্ছা শান্তাদি, শেষের লাইনটে কি ?

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়—

তারপর ?"

হাসিয়া শান্তা বলিল, "আবার ওমারখৈয়াম্ সুরু হল বুঝি ?"

"সত্যি আমার বড্ডই ভালো লাগে। বলুন না তারপর কি ?"

"ভুলে গেছি।"

বারীন মিষ্টি করিয়া বলে, "আপনি ওমারখৈয়াম্ ভালোবাসেন না কেন?"

"ভারি চপল, লঘু—কোনো গাম্ভীর্য্য নেই।"

"কী যে বলেন আপনি! অমন থট্‌ফুল্ কবিতা অথচ অমন অ্যাপীলিং আমি কমই দেখতে পাই। মানুষের দেহমন জড়িয়ে একান্ত সঙ্গোপনে যে অনুভূতিটি রয়েচে, তারই জীবন্ত ব্যঞ্জনা। কবি দার্শনিক বটে!"

শান্তা উত্তর দেয়, "দর্শন কোথায়? ও যে এক্কেবারে অদর্শনের বিলাপোক্তি। দিশেহারা নাবিক ভ্রান্ত, শ্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে—স্রোত যেদিকে ঠেলে, হাওয়া যেদিকে বয়, সেই দিকেই তার গতি। কোনও চেষ্টা নেই, উদ্যোগ নেই, কিচ্ছু না! বার্ণার্ড শ'এর একটা কথা আমার ভারি ভালো লেগেচে—টু বি ইন্ হেভ্‌ন্ ইজ্ টু ষ্টিয়ার, টু বি ইন্ হেল্ ইজ্ টু ড্রিফ্‌ট্ (To be in Heaven is to steer, to be in Hell is to drift.)।"

বারীন হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "ঠিক্—মনে পড়ে গেছে।—

মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

কি সুন্দর!"

"বেজায় স্থূল, দেহসর্ব্বস্ব!"

"দেহসর্ব্বস্ব!!—দেহাতিগ বলেই যে এ প্রেম আমার কাছে এত মিষ্টি লাগে! দেহকে আশ্রয় করে যে কামনা ওঠে, তাকে কী ইন্দ্রজাল দিয়েই না ওমার রং ফলিয়েছে, স্থূলকে তুলে দিয়েচে সূক্ষ্মমায়ায়, নেশাকে করেচে আবেশ। সবটা জীবন যেন রঙীণ বসন্ত হয়ে দিগন্তে

ছড়িয়ে পড়ে। অবসাদ নেই, আছে পূর্ণতার বিশ্রাম, বুভুক্ষা নেই, শুধু তৃপ্তি!”

স্বপ্নভরা দুইটি নেত্র মেলিয়া বারীন দূর দিগন্তে চাহিয়া থাকিয়া নীরব হইল। সুদূরের নীলাভছায়া অব্যক্ত মায়ায় তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে বুঝি, সর্ব্বাঙ্গে যেন ঐ বসন্তের আবেশভরা বিশ্রাম আসিয়া প্রলেপ বুলাইতেছে।

আর কোনও কথা নাই, মৌনতার পরিপূর্ণ ভাষা তাহার অন্তর জুড়িয়া।

শান্তা সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনমনে বারীন আবার গুঞ্জরণ তুলিল, “সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর!”

হঠাৎ আবেশ টুটিয়া গিয়া বারীন জাগিল। অন্তরনিবদ্ধ দৃষ্টিখানি বাহিরে ফিরাইয়া আনিয়া সলজ্জ মাধুরীর সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, আপনাকে কি বলে ডাক্‌ব, শান্তাদি?”

“কেন, এই যে ডাক্‌লে?”

“দিদি?—” বারীন হাসিয়া বলে, “নাঃ, ওটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। ও যেন ঠিক কম্‌প্রিহেনসিভ্ হয় না,—না?”

শান্তা হাসিয়া বলিল, “তবে?”

“কি জানি কি! কোন্ নামটাতে আপনাকে মানায় ভালো, খুঁজেই পাচ্ছি না।—”

“তবে ঐ দিদিই ভালো।”

বারীন আস্তে আস্তে মাথা দোলাইয়া বলিল, “ওতে যে আমার ফীলিংস্ ঠিক প্রকাশ করা যায় না!”

অর্দ্ধজাগরূক, অর্দ্ধেক আত্মভোলা তার নিষ্কলঙ্ক মুখখানির সুস্নিগ্ধ

হাসিটুকুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তার কী যে মনে হইল। কবে ছেলেবেলায দেখিয়াছিল—প্রকাণ্ড সবোবব, অতল গভীর, তবু স্বচ্ছ জল টল্‌টল্‌ করে, শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যেন; পারেব সবুজ গাছগুলি পত্রপুষ্পের পসরা লইযা তার বুকখানি ছাযাশীতল করিযা রাখিয়াছে, তবু উন্মুক্ত আকাশের আলোর গতি খর্ব্ব হয় নাই, অনাবিল জলরাশি আলোকে, সৌন্দর্য্যে, হরিতে, হিরণে বিচিত্র। সেই দীঘির ধারে গাছের ছায়ায বসিযা থাকিতে সে বড় ভালবাসিত।—সেই ছবিটি মনে পড়িয়া গেল।

পড়া করিতে চায়না মাণিক মোটেই। ছবির বই খুলিয়া যখন বসে, তখন মনের অভিনিবেশ যথেষ্ট, শ্লেট্ পেন্সিল লইয়া কাটাকাটি খেলিবার সময় চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না, কিন্তু বইয়ের অক্ষরগুলি সুস্থিরে আবৃত্তি করিতে হইলে অথবা শ্লেট্ পেন্সিল সহযোগে যোগের অঙ্ক বসাইতে হইলেই চট্ করিয়া তাহার কাণে যায়, মিনি বিড়ালটা কোথায় কাঁদিতেছে, রাস্তায় কাহারও মোটরকার থামিল কি না, জ্যেঠাইমা বুঝি ডাকিতেছেন।

শান্তা রোজ সকালে একবার করিয়া বসে এই ছাত্রটির তদারক করিবার কাজে, কখনও মন যোগাইয়া, কখনও ধমক্ দিয়া।

আজও মাণিক বেজায় বিরক্ত করিতেছে। পাঁচ, সাত আর তিনে যোগ করিয়া একবার হয় বারো, একবার নামে পাঁচ কিন্তু হাতে থাকে না কিছুই।

শান্তার মনটা কেমন ভাল ছিল না, কিছু উন্মনা। বারে বারে মাণিকের দুষ্টামিতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, "মার খাবে কিন্তু এর পরে সত্যি, শীগ্‌গির মন দিয়ে বোসো।"

ছোড়দির কাছে ভৎ‍র্সনা লাভ হইলে মাণিকের ভারি অভিমান হয়, কারণ ভৎ‍র্সনা সে করে না প্রায় মোটেই। আজকারটাও অপ্রত্যাশিত। সে ঠোঁট ফুলাইয়া পেন্সিল ফেলিয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

"ওকি হচ্ছে ?"

"তোমার সঙ্গে কথা বলব না আমি।"

শান্তা হাসিল, "কথা নাই বা বল্লি, আঁক কষে ফ্যাল্ শীগ্‌গির।"

"কষ্‌ব না তো।"

"ভারি দুষ্টু হচ্ছ দিন দিন। কাকাবাবু কি রকম বক্‌বেন দেখো!"

"ঈস্!" বালক বইশ্লেট পা দিয়া ঠেলিয়া এদিক ওদিক ফেলিয়া ছুট্ দিল, "আমি বাবাকে গিয়ে বলি ছোড়দি আমায় বকেছে।"

শান্তা উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপরে 'প্রবাসী' খুলিয়া বসিল। পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া যায়, পড়িবার মন নাই। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসে, মনে আবেশ লাগাইয়া দেয়। শীত কাটিয়া গিয়াছে, মাঘের আর পাঁচ ছয়টা দিন বাকী। শ্রীপঞ্চমী তার সোণার কাঠি দিয়া ধরার অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদের রহস্যদ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়া গেছে। ঐ মুক্ততোরণপথে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যপদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছে বাসন্তীর যত অগ্রদূতী। নৃত্য এখনও সুরু হয় নাই, এখনও চলিতেছে শুধু মায়াপুরীর মায়াপরীদের অস্ফুট কাণাকাণি, অদৃশ্য অঞ্চলের ইঙ্গিতভরা একটুখানি স্পর্শ। হিমানী যখন তাহার বুকের শেষ কাঠিন্যটুকুকে গলাইয়া বিদায়ের নিশ্বাস ফেলে, আর তারই হিল্লোলে রণিয়া ওঠে যেন পুলকের কম্পন, সেই অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণটির মর্ম্মকথা কাণ পাতিয়া একবার শুনিয়া লইতে শান্তার সাধ হয়। কৃশ তপোমূর্ত্তিখানি ফুলে ফলে হাসিয়া উঠিয়া কেমন করিয়া নবযৌবনের রূপ ধরে!

একহাতে একটা কমলালেবু লইয়া আবার মাণিক আসিয়া উপস্থিত। ছোড়দিকে দেখিয়াই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল পাঁচ মিনিট আগেকার ঘটনাটি। বাঁ হাতটি তৎক্ষণাৎ পিছনে লুকাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "দেব না তোমাকে তোমার জিনিস!"

শান্তা হাসিয়া বলিল, "কমলানেবু? আচ্ছা নাই-ই দিলে।"

"ইস্, লেবু তো তোমার নয়, আমার।"

"তবে কি?"

"আছে তোমার একটা জিনিস, দেব না।"

"আচ্ছা।"

ঝগড়ার পরিণতিটি জুৎসই হইল না দেখিয়া মাণিক ক্ষুণ্ণ হইল। পরক্ষণেই দুইহাতে লেবু সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে গুপ্তধন বাহির করিয়া আনিল, "এই নাও তোমাব চিঠি।"

খামের চিঠিখানি—অপরিচিত হস্তাক্ষর। কে এ?

কৌতূহলে, আশঙ্কায় শান্তা চিঠি ছিঁড়িল।

কলিকাতা

সন্ধ্যা

শান্তা,

বল্‌তে তো দিলে না, লিখবার অধিকার আছে কিনা জানিনে। তবু তো লিখ্‌ছি দুঃসাহস নিয়ে। এতক্ষণ অবধি আমি জলস্পর্শ করিনি, জানো? (সময পাই নি, কেবলই ভাবছি)। কাজেই ভরসা করি আমার মনের পবিত্রতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে হয় তো। তুমি যে আমার দেবী, তোমার পূজায তো অশুচি মন নিয়ে অর্ঘ্য রচনা কর্ত্তে পারিনে।

যা তোমাকে বল্‌তে চাই, আজও হয়ত সব বল্‌তে পারব না—সে যে বলার অতীত। তুমি যে আমার কতখানি, আমার কী যে সম্পৎ, তোমায় বোঝাতে পারব না, শান্তা। যদি মনের কোণে একটুখানি স্থান আমায় দিতে, তাহলে তুমি অনুভব কর্ত্তে পার্ত্তে। দেবে কি?

তোমায় এত ভালোবাসি—তুমি যদি আমায ঘৃণাও কর, তবু আমি জন্মজন্মান্তর (যদি তা থাকে) আমার সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে তোমায় পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করে কৃতার্থ হবো। তাই আমার এ জীবনের সার্থকতা। আমি জানি আমার এ চাওযা বিফল হবে না, এ জন্মে না হোক্ পরজন্মে পাবই। বলো তুমি—বিফল কি হবে? হতে কি পারে?

জানি তুমি আমায় ভালোবাসো না। তবু লক্ষ্মী আমার, আমায়

অশুচি বলে ঘৃণা কোরো না। তোমার প্রতি আমার এ প্রেম—এ যে আমার মনের যা কিছু শুভ্র, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পুণ্য, তাই দিয়ে রচা। তোমার যোগ্য যদি এ না হয়ে থাকে, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে পারো, কিন্তু পূজার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না, লক্ষ্মী। তাহলে আমি বাঁচ্‌বো কি করে বলো?"

উত্তর পাবার অধিকার আমার আছে কিনা জানিনে। যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু জানিও—কি আমায় কর্ত্তে হবে! দেবী হয়ে আমায় পথ দেখিয়ে দিও। এতে তো দোষ নেই?

ইতি—তোমারই সত্যকাম

বারেক ত্রস্তদৃষ্টি বুলাইয়া যাইতেই চিঠিশুদ্ধ শান্তার হাতখানি কোলের উপর শিথিল হইয়া পড়িল।

তারপর?—

চিন্তার সামর্থ্য আর নাই। সত্যকাম—ওঃ, সত্যকাম! ধরা না দিয়া আর পারি কি? বসন্ত তার পূর্ণযৌবনের রূপলাবণ্যের পসরা লইয়া চোখের সামনে নাচিতেছে ঐ! একি রূপ, একি মোহ, একি ব্যাকুলতা! এ যে কতদিন ধরিয়া তাহাকে সাদর আহ্বানে ডাকিয়া আসিতেছে, সে এতকাল শোনে নাই কেন? কেমন করিয়া একলা মনে অন্ধ হইয়া, বন্ধ হইয়া, বধির হইয়া এতদিন সে ছিল? "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তব অবগুন্ঠিত, কুন্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তাবে।"—না, আর সে ইহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে না। কেন রাখিবে? তাহার আছে প্রাণভরা মধু, দেহভরা যৌবন। সে ঢালিবে। ঢালিয়া গলিয়া আপনি অমৃতধারা হইয়া তাহার সত্যকামকে প্লাবিত করিয়া বহিয়া লইয়া যাইবে—তবেই না সে সার্থক?

দিনমান অলক্ষ্যে কাটিয়া গেল। ভাবের বন্যা থামিয়াছে, ভাবনার সমুদ্র কেবল থম্ থম্ করিতেছে।

ক্ষতি কি? তাহার অন্তরের যা সত্য, সত্যকামের আকুল চোখের সামনে খুলিয়া ধরিতে ক্ষতি কি? সত্যকাম সুখী হইবে, সেও সুখী হইবে। কেন তবে এতদিন ধরিয়া এত আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মনিপীড়ন? সত্যকামের জীবনপদ্মখানি যে তাহারই জন্য উন্মুখ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার রক্তচরণপাতের প্রতীক্ষায়। না, না, চরণপাত কেন, সে ইহাকে মাথায় তুলিয়া লইবে। দ্বিধা কিসের? তাহার প্রেমের কৃপণতায় একটি প্রস্ফুট সুকুমার তরুণজীবন শতধা ভাঙিয়া পড়িতে চায়, সেকি তাহাকে হাত ধরিয়া বুকে টানিয়া লইতে বাধ্য নয়? সত্যকামকে একটুখানি ভালোবাসিতে পারিলে সত্য কৃতার্থ হয়, সে আপনি ধন্য হয়, জগতে কাহারও কোনও ক্ষতি তো নাই। সংসারে যে যেথায় যেমন আছে তেমনই থাকিবে, শুধু তাহাদের দুইখানি প্রাণ প্রেমের মধ্যে মিলিয়া গিয়া নূতন আনন্দের উৎস সৃজন করিবে। বিশ্বভাণ্ডারে আনন্দসম্পৎ বাড়িবে বই কমিবে না। এই তো তাহার এতদিনকার আরাধ্য আদর্শ! সত্যকামের প্রেমকে সাদরে সগৌরবে বরণ করিয়া লওয়াই তাহার ধর্ম্ম না? অনির্ব্বচনীয় আনন্দে শান্তা শিহরিয়া উঠিল।

চিঠিখানি খুলিয়া কতবার করিয়া পড়িল, মনে নাই। প্রত্যেকটি পংক্তি কী মাধুর্য্যে লীলাময়! প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি তাহার সত্যকামের মনের গহনতলটি কী আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়!

"তোমায় এত ভালোবাসি—যদি তুমি আমায় ঘৃণাও কর, তবু আমি—"

ঘৃণা? ওগো সত্যকাম, তুমি কি আমায় এতদিনেও জান নাই?

কিন্তু—।

আবার শান্তা চিন্তাব ধারা হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু সে যে সংসারের কাছে মুক্তকণ্ঠে জানাইয়া ফেলিয়াছে, বিবাহ সে করিবে না। সংসারের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়, বিনয়, আদেশের বিরুদ্ধে সে যে বিদ্রোহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বরণ করিয়াছে। আজ তবে পথ, গুরুজনগণ কি মনে করিবেন? নিজেব বাক্য, নিজের সংকল্পকে প্রত্যাহার করিবার মত দুর্ব্বলতা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? এই তাহার শক্তির গৌরব, এই কি বীর্য্য? লোকে হাসিবে যে!

হাসুক্। তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়?—সত্য, আমার সত্যকাম!

ঝি আসিয়া খবর জানাইল, নীচে অপরেশবাবু আসিয়াছেন।

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া জাগিবার মত শান্তা চকিত, ভীত, বিব্রত হইয়া উঠিল। একি ব্যাঘাত? এক নিমেষে মনের রঙীণ কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, "বল গে, আমার শরীর ভালো নেই আজ।"

দাসী ফিরিল। খানিকপরে এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া আবার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। অপরেশ লিখিয়াছেন—"শুধু পাঁচ মিনিটের জন্তে একবার নীচে আসবেন'কি? একান্ত অনুরোধ।"

শান্তার কান্না আসিল।

২৯

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অপরেশ মৌন হইয়া রহিলেন। মন এমন কাণায় কাণায় ভরা, তাহার পথ করিয়া দিতে ভয় হয়, পাছে বাঁধ ভাঙিয়া উছলিয়া বান ডাকিয়া উঠে।

অগত্যা শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন?"

ইতস্ততঃ করিয়া অপরেশ বলিলেন, "আপনার শরীর অসুস্থ?"

"হ্যাঁ—অনেকটা।"

ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অপরেশ একটিবার নীরবে নিশ্বাস ফেলিলেন। সময় যখন থাকে, তখন অসুস্থতা; শরীর যখন সুস্থ, তখন সময়ের অভাব।

বিরস মুখখানা তুলিয়া বলিলেন, "আমি যদি আপনার চেয়েও বেশী অসুস্থ না হতাম, তাহলে আজ আসতাম না। দুঃসহ বলেই অসময়েও আস্‌তে বাধ্য হয়েছি। মাপ কর্ব্বেন।"

অধৈর্য্যের সঙ্গে শান্তা বলিল, "ওসব থাক্, কাজের কথা থাকলে বলুন।"

"এই-ই আমার একমাত্র কাজের কথা আজ।"

শান্তা প্রাণপণ বলে নিজেকে সুস্থির রাখিতে চেষ্টা করিয়াও যেন আজ সংযমের বাঁধ হারাইল। উষ্ণ হইয়া বলিল, "অপরেশবাবু, এই চপলতা আপনার মত প্রবীণ ব্যক্তির শোভা পায় না। অন্ততঃ আমি যে এ ধৃষ্টতা আপনার কাছ থেকে সহ্য করবো না, এটুকু জানবেন।" সশব্দে চেয়ার ঠেলিয়া শান্তা উঠিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে অপরেশের পরিম্লান মুখখানির উপর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া

গেল, কালিমামাখা চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল। দ্রুতপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া দরজার কবাট্ বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, "না—যাবেন না।"

শান্তার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল।

অপরেশ বলিলেন, "ভয় নেই। আমি পশু নই, এটুকু বিশ্বাস করবেন। আমার অপরাধ শুধু এই, আমি ভালোবাসি। হ্যাঁ—আমি ভালোবাসি। সেই কথাটা না জানিয়ে তোমায় ছাড়তে পারি না।"

শান্তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। কম্পিত হাতখানি দিয়া শক্ত করিয়া চেয়ারটা ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অপরেশ দুয়ারের কাছ হইতে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া শান্তার সামনে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের মুখের দীপ্তি আবার মিলাইয়া গেল, আবার আবেগভরে চক্ষুযুগল ম্লান হইয়া আসিল। মিনতি করিয়া বলিলেন, "শান্তা, তুমি তো হার্টলেস্ নও, কেন তবে আমার এ যন্ত্রণা বুঝতে পার্চ্ছ না? ভল্‌ক্যানো দেখেচ কখনো, কল্পনা কর্ত্তে পারো তো?" একটা তপ্ত নিশ্বাস শান্তার কপালে আসিয়া লাগিল।

কোনও উত্তর মিলিল না।

অপরেশ আবার বলিলেন, "আঘাতের পর আঘাত দিয়ে দিয়ে তুমি আমায় কোথায় নিয়ে ফেলেছ তুমি জানো না। যেটুকু এখনও বাকী আছে, সেটুকুও চূর্ণ কর্ত্তে চাও? করো—আমি অসহায়!"

স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিস্তব্ধ ঘরখানির দেয়ালে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া শান্তার কাণে বড় তীব্র হইয়া বাজিল! সে অশান্তভাবে বলিয়া উঠিল, "আপনি কি বল্‌চেন বুঝতে পারচেন না।"

বেদনার হাসি ফুটাইয়া অপরেশ বলিলেন, "বুঝবার ভুল বড় আমার হয় না।"

বুঝিবার অক্ষমতা আজ শান্তারই। এই অধীর পুরুষটির উদ্দাম

ভালোবাসার স্রোতের মুখে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এক একবার অপমানে ও রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া ইচ্ছা করিতেছিল, সত্য সত্যই পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ঐ অকৃত্রিম বেদনাভরা আঁখির দৃষ্টি আর রুদ্ধ হৃদয়ের বাঁধা-না-মানা তপ্ত নিশ্বাস আসিয়া মনটাকে করুণায় সজল করিয়া ফেলিতে চায়। পথ না পাইয়া শান্তা ক্ষোভে ও গ্লানিতে বাক্যহারা হইয়া বসিয়া রহিল।

অপরেশ বলিলেন, "আমার শ্রদ্ধা—আমার ভালোবাসা এতই কি হেয়, সে শুধু আপনার ঘৃণাই পাবে?"

শান্তা নিরুত্তর।

অধৈর্য্য হইয়া অপরেশ বলিলেন, "একটা কথার উত্তরও আপনার কাছ থেকে মিল্‌বে না, এমনি দুর্ভাগ্য নিয়েই কি জন্মেছিলাম?—হুঁ, অসম্ভব নয়।" স্বর আরও গাঢ় হইয়া আসিল, "নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে হয় না, একথা শুনেচি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ যে ঘটে তা জানতাম না। আমাব নিজেব জীবনেই শুধু তাই দেখলাম। আচ্ছা, এমন আঁধার গুহা দেখেচেন কখনো যেখানে আলোর রেখাও কখনো উঁকি মারেনি, যেখানে শুধুই অন্ধকার, বর্ণহীন, কঠিন পাথর?" প্রাণপণ যত্নে একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, "কিন্তু সে পাথরের বুক চিরেও ঝর্ণা নামে জানেন? বিশ্বাস হয়?"

শান্তা তাহার সমস্ত দর্শনের জ্ঞান ও অনুভূতি একত্র করিয়া এতক্ষণে একটা উত্তর দিল, "রবিঠাকুরের একটা লাইন আছে জানেন?—

'সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।'"

অপরেশ ভালো করিয়া শান্তার মুখের দিকে চাহিলেন। কতক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দুর্ভাগ্যের কান্না কাঁদতে আর কখনো শুনেচেন আমাকে? আমি তেমন কাপুরুষের দলে নই, এ গৌরবটুকু আমার আছে। কিন্তু বেশী ঘসলে যে ক্ষয়ে যায়, বেশী আঘাতে ফাটে একথা কি মানো? সীমা সবারই আছে। সংসার আমার ওপরে যে অবিচার করেছে করুক্, কারো কাছে সে জন্যে অভিযোগ আন্‌ব না। কিন্তু তুমি যে লাঞ্ছনা দিচ্ছ, এইখানে আমি শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর সইবার শক্তি নেই।—কি বলছিলে? প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ? সত্যি? বিশ্বাস কর্ব্ব?"

তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন উছলিয়া উঠিল। দীর্ঘ দেহখানি আনত করিয়া শান্তার মাথার উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে আমার এ বুকভরা প্রেম এমন করে ব্যর্থ হয় কেন? আমার একান্ত ভালোবাসার দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েও কেন তোমাকে বুকের কাছে টেনে আনতে পারি না? বল শান্তা, বল।"

শান্তা সভয়ে মাথা তুলিয়া তাঁহার কৃষ্ণতারক গভীর চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিল, বিশ্বের সমস্ত ভালোবাসা যেন ঐ দৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কে বলে তিনি বিগতযৌবন? সমস্ত দেহ অপূর্ব্ব লাবণ্যভরে টল্‌মল্ করিতেছে, যৌবনের দীপ্তি যেন থর থর করিয়া কাঁপে। মুহূর্ত্তের তরে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া শান্তা অবোধের মত টেবিলের উপরে মাথা ঠেকাইয়া অবশ হইয়া পড়িল।

অপরেশ বলিলেন, "শান্তা, কি দোষ আমার বল না?"

মাথা না তুলিয়াই দিশাহারা ভাবে শান্তা উত্তর দিল, "কিছু নেই।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া অপরেশ বলিলেন, "শান্তা, একটা কথা সত্যি করে বল—তুমি কি আর কাউকে ভালোবাসো?"

শান্তা চমকিয়া উঠিল। আপনার অলক্ষ্যে মুখখানা একবার অস্বাভাবিক রক্তিম হইয়া উঠিয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কে বলিতে পারে? কে বিশ্লেষণ করিয়া দিতে পারে, অপরেশের প্রতি এই বিরাগ তাহার কেন? এই হতভাগ্য মানুষটির প্রেমকে ঘৃণা করিবার জন্য তাহার মন এত ব্যগ্র কেন হয়? অন্যায় বলিয়া—অপবিত্র বলিয়া? কিসে অন্যায়? শান্তা স্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিল, এই ন্যায় ও পবিত্রতার মাপকাঠি এমন কঠোর করিয়া সে তো সকলের বেলায় প্রয়োগ করে নাই! চকিতে সত্যকামের মুখখানা চোখের উপর দিয়া খেলিয়া যায়। অপরেশের দুঃখশ্রান্ত জীবনের উপর আরও একটি নির্ম্মম দুঃখের বোঝা চাপাইবার জন্য তাহার এত যে আগ্রহ, তাহা শুধুই কর্ত্তব্যের প্রেরণায কিনা, সন্দেহের কথাই তো বটে।

অপরেশ চাহিযা চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। চারিদিকে নীরবতা। অপরেশের মনে হইল যেন কত যুগ!

শান্তা অনেকক্ষণ পরে প্রাণপণ চেষ্টায় মনের সকল কর্ত্তব্য ও শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তুলিয়া বলিল, “অপরেশবাবু, আমি একটা প্রস্তাব করি?”

স্বরের এই অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধতা অপরেশের কাণে যেন গানের রেশ হইয়া বাজিল। উৎসুক হইয়া বলিলেন, “কি প্রস্তাব, শান্তা?”

“আমি যদি আজ থেকে আপনার বোনের অভাব পূর্ণ করি, তাহলে আপনি সুখী হবেন?”

অপরেশের মুখের সজীবতা মিলাইয়া গেল, “আমাকে ব্যঙ্গ করে তুমি এতই আনন্দ পাও, শান্তা?”

ব্যঙ্গ তো সে করিতে চাহে নাই! মনের সমস্ত আকর্ষণ বিকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া অনেক প্রয়াসে এতখানি অগ্রসর সে হইয়াছে, এর বেশী তো আর সম্ভব নয়। অপরেশ এমন নির্ব্বোধ, এমন লোলুপ কেন?

অপরেশ বলিলেন, "আমাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে লাভ নেই ; আমি বুঝতে পার্চ্ছি। বুঝতে পারলেও মনকে কন্ট্রোল কর্ত্তে তো পারি না !—শান্তা !"

মনের মধ্যে যে সংশয়, আঘাত, তিরস্কার আসিয়া একে একে উঁকি মারিতেছিল, শান্তা তাহা লইয়া আব কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এ কি দুর্ব্বিপাক !

অপবেশ বলিলেন, "তোমাব প্রেমের কৃপা কার জীবনকে ধন্য করচে আমি জানি না। শুন্‌বার অধিকাবও আমার নেই। কিন্তু একথা আমি জোর করেই বল্‌ব, তাব ভালোবাসার চেয়ে আমাব ভালোবাসা বেশী সত্য, বেশী প্রবল। তার যৌবনের চেয়ে আমাব যৌবন তোমাকে অনেক বেশী দাবী করে। তার যাতনার চেয়ে আমাব যাতনা অনেক গভীর। তাকে বঞ্চিত কর্লে সে হয়ত আহত হতে পারে, কিন্তু আমাকে করচ তুমি হত্যা। আঁৎকে উঠ্‌চ কেন ? এ আমার একান্ত খাঁটি কথা, অন্তর্য্যামী জানে। আমাকে যদি বাঁচাতে কেউ পারে, সেও তুমি, আমাকে যদি ধ্বংস কেউ কবে, সেও তুমি। তুমি আমারই,—একান্ত আমার। তোমার প্রেম যাকে খুসী দিয়েচ, কিন্তু আমার প্রেম তোমাকে কখনও ছাড়তে পারবে না।"

শান্তা বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কেন আপনি মনগড়া কাহিনী বানিয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন ? আমি—"

"কি মিথ্যে ? যাকে খুসী কৃতার্থ করেচ, কিন্তু আমাকে প্রতারণা করে লাভ কি ?"

শান্তা অধীর হইয়া বলিল, "থামুন, থামুন। আমার প্রেম নেই, কি করে দেব ? আমি ব্রহ্মচারিণী।"

অপরেশ নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

শান্তার সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা ধরিয়া কে যেন জোরে মুচড়াইয়া দিল। এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে ক্রমাগত ধাক্কা লাগিতে লাগিতে তাহার হৃদয় আর মস্তিষ্ক যখন ক্ষিপ্ততার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই অস্থির মুহূর্ত্তে উপায়বিহীনভাবে এই কথাটুকু মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহা ছাড়া আর কী করিতে পারিত সে ?

অপরেশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারিণী ! সেকি শান্তা ?"

শান্তা নিজেকে সামলাইতে ব্যস্ত, উত্তর মুখে আসিল না।

অপরেশ বলিলেন, "মানুষের মন আর মানুষের দেহ যা চায়, তাকে বাধা দেওয়ার মত মূঢ়তা আর নেই, শান্তা ! কেন নিজেকে বঞ্চিত কর্চ্ছ ? ব্রহ্মচর্য্যের কোনও মানে হয় না।"

গম্ভীর মুখে শান্তা উত্তর করিল, "হোক্ না হোক্, সেই আমার ব্রত।"

"সত্যি !!"

"মিথ্যে আমি বলি না।"

অপরেশ মুহূর্ত্তে নিস্পন্দ হইয়া তাহার ক্লিষ্ট মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ তীব্র আবেগভরে শান্তার দুইখানি হাত আপনার মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল মিনতিতে কহিলেন, "এ ব্রত ভাঙ শান্তা। আমাকে বাঁচাও।"

শান্তা অবিচল গাম্ভীর্য্যভরে হাত দু'খানা ছাড়াইয়া লইল।

সত্যকাম—অপরেশ। মাঝখানে অসহায় একাকী সে তরুণী তরণীর মত ভাসিতেছে। হাল কোন্‌দিকে ফিরাইবে? স্রোত একদিকে টানে, বায়ু আব এক দিকে,—তরঙ্গের স্থিরতা নাই। অশান্ত জলরাশির ঘূর্ণাবর্ত্তের সঙ্গে সংঘাত করিতে করিতে বুক ভাঙিয়া আসে। হাল ছাড়িয়া দিলে তরী কোন্‌ মুখে ঘুরিবে, তাহা সে জানে, ভাল কবিয়াই জানে। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার অধিকার কি তাহার আছে? যে ভার বিধাতা তাহার স্কন্ধে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে তুলিযা দিয়াছেন তাহা এমন হেলায় ফেলিয়া দেওয়া কি উচিত? কর্ত্তব্যবিমুখ সে নয়, আমাদের ভারে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার দুর্ব্বলতা সে স্বীকার কবে না।

এ সঙ্কট তাহার জীবনে কেন আসিল? পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্ত্তব্য লইয়া যাহারা মাথা ঘামায় না, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে মানিযা লইতে যাহাদের দ্বিধা নাই, সে তাহাদের দলে নয়! তা যদি হইত তবে আজ তাহার সম্মুখে সহজ পথ! কোনও প্রশ্ন নাই, দ্বিধা নাই, সমস্যা নাই। সে সমস্যা তাহার পথের সামনে আজ দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে উপহাসের হাসিতে কখন্‌ উড়াইয়া দিতে পারিত! যে মুহূর্ত্তে সে সত্যকামকে ভালোবাসিল, সেই মুহূর্ত্তেই প্রেমের কাছে ধরা দিয়া সুখী হইতে পারিত। কিন্তু তাহা পারিল না, আদর্শ-উদ্‌যাপনের সংকল্পের কাছে বাধা পাইল। উঃ, জীবনটা কি কঠোর!

তবু তো ধরা দিতে বসিয়াছিল, যুক্তিজালে সংশয় ছিন্ন করিয়া প্রেমকে জয়ী করিতে চলিয়াছিল।—সংশয় ছিন্ন করিয়া? সত্যসত্যই সংশয় ঘুচিয়াছিল কি? না, প্রবৃত্তিরই সূক্ষ্ম মায়া, নিজের মোহ—কে জানে?

থাক্, থাক্, সে কথায় কাজ নাই। সে সংশয় ঘুচুক আর নাই ঘুচুক, আজ যে নূতন সংশয়! আজ যে পথ একেবারে রুদ্ধ। মুক্তি পাইবার পথ খুঁজিতে গিয়া দৃষ্টি বারবার ধাঁধিয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্য অপরেশ কেন আসিয়া তাহার পথের মাঝখানে উদয় হইয়া সব এলোমেলো করিয়া দিল?

কাকীমার মত যাহারা এক নিমেষে জীবনের সকল ভালোমন্দ নির্ণয় করিয়া ফেলিতে পারে, তাহারা নিশ্চিন্তবিবেকে সত্যকামকেই ভালোবাসিয়া অপরেশকে পায়ে দলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইত। সে তাহা পারিবে না। দলিয়া যাইতে যদি বা পারে তো মুখে আর এ জীবনে হাসি ফুটাইতে পারিবে না। মানুষের হৃদয়ের রক্তে যে পথ ধৌত করা হইল, সে পথে তাহার আনন্দের রথ চলেনা। মানুষের বুকের পাঁজর ভাঙিয়া যে প্রাসাদ গাঁথা হইল, সে সৌধ তাহার উপভোগ সাধ পূরায় না। তাহার ভালো-লাগা-না-লাগায় মানুষের মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না; তাহার গ্রহণ প্রত্যাখ্যানেই মানুষের ভালোবাসার পরিমাপ নয়। সে কেমন করিয়া অপরেশকে অশুচি বলিয়া ঘৃণা করে, কেমন করিয়া তাঁহাকে ঐ প্রেমের অপরাধে শাস্তি দিবার স্পর্দ্ধা করে? তাঁহার হৃদয়খানি ছিঁড়িয়া শতছিন্ন হইতে বসিয়াছে, তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সেই ভাঙা হৃদয়ের উপর দাঁড়াইয়া সে আপনার প্রেমোল্লাসে নৃত্য করিবে, এমন দানবী তো সে কোনকালে ছিলনা আজও হয় নাই। অপরেশের ছিন্ন হৃদপিণ্ডকে চুম্বনে শতদলে ফুটাইয়া তুলিতে যদি পারিবে না তো সমবেদনার মলয়স্পর্শে প্রলেপ বুলাইতে তো পারে! তাঁহার বিশীর্ণ ম্লানমুখে হাসি ফুটাইতে যদি নাই পারিবে, তো নিজের মুখের প্রমোদহাস্য মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার ব্যথার ভাগ তুলিয়া লইতে তো পারে! বুভুক্ষিত অপরেশ আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া তাহার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া আছেন, সেই তাহার হৃদয়ের মধু নিঃশেষে সে সত্যকামের

অধরে তুলিয়া ধরিবে তাঁহারই চোখের সম্মুখে? এ কাজ সে পারিবে না, কখনও না। তাহা হইলে তাহার আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা বৃথা, চিরজীবনের সাধনা বৃথা!

সত্যকামের সুকোমল মুখখানি হঠাৎ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। প্রাণপণ ব্যাকুলতায় শান্তা চক্ষু মুদিয়া ছবিখানি মুছিয়া ফেলিতে চায়। ঐ আঁখির কোণে চঞ্চল দৃষ্টির ইঙ্গিত, ঐ স্ফুরিত অধরে স্নিগ্ধ মধুর হাসিটি, এ কি ভোলা যায়? সেদিন সে কী আবেগেই না নিজেকে নিবেদন করিতে আসিয়াছিল, হৃদয়ভরা কী অধীরতা! ফিরিয়া যাইবার কালে কী বেদনা, অধর দুটিতে কত অভিমান!—সত্যকাম ফিরিয়া গেল? সে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল? এত সে হৃদয়হীন? আর তো সত্যকাম ফিরিয়া আসিল না! উঃ! কি নির্ম্মম বেদনাই না সে তাহাকে দিয়া ফেলিয়াছে! শান্তার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে এখনই টানিয়া লইয়া আসে। এতখানি ব্যথা সে কি তাহাকে দিতে পারে? তাহার একটুখানি হাসি পাইলে সত্যকাম যদি সুখী হয়, তো সে খুলিয়া ধরিবে হাসির নির্ঝর, তাহার একটু প্রেমের ছিটা লাগিয়া যদি সত্যকাম তৃপ্ত হয় তো সে প্রেমের বন্যা হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া নিবে।

সপাং করিয়া মনের মধ্যে কে যেন চাবুক মারিল। না, না, না,—সে ভুল বকিতেছে। সত্যকামকে দূরে সরাইতে হইবে, ব্যথা দিতে হইবে।—কেন? কিসের জন্য? অপরেশ? মিথ্যা, ভুল, প্রবঞ্চনা! সত্যকামের চেয়ে সত্য কেউ নাই। সত্যকামের আনন্দের কাছে আর সবার আনন্দ তুচ্ছ। দূর হউক অপরেশ, দূর করিয়া দাও তাহার পঙ্কিল প্রেমের অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি!

অস্থির হইয়া শান্তা ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল। ইচ্ছা করে,

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ও[illegible]তার আসন ধরিয়া প্রাণপণে নাড়া দিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা [illegible] এ নিপীড়ন তাহাকে কিসের জন্য ?

বুকফাটা কান্না আসিয়া ও[illegible] গিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। চোখের উদ্গত বাষ্প বান ডাকিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ হিমানীকণার মত জমাট বাঁধিয়া গেল। অন্ধকার নিশীথের তারকার মত তাহার চক্ষু দুইটি কেবল জ্বল্ জ্বল্ করিয়া আকাশেরই তারকার দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল।

তাহার এ বিলাপ কিসের ? সে কি এতই দুর্ব্বল, এতই অসহায় ? জীবনব্যাপী আদর্শের উদ্‌যাপনার মুখে শক্তি কি তাহার আসিবে না ? অন্ধকারের বুকে আলো জ্বলে, নিদাঘের তৃষ্ণায় অমৃতধারা ঝরে, তাহার একান্ত দুঃসহ বেদনার দিনে কি সহিবার বল দেখা দিবে না ?

সে গর্ব্ব করিয়া অতসীকে বলিয়াছিল, প্রলোভনকে জয় করিবার শক্তি নারীর আছে। আধ্যাত্মিক বীর্য্য দিয়া দেহের কামনার উপর আধিপত্য করিতে সে জানে। আজ ? আজ তাহার সেই অগ্নিপরীক্ষার দিন। প্রবৃত্তির কাছে এবার হার মানিবে কি ? না, হার মানিবার মেয়ে সে নয়। সত্যকামকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু সে ভালোবাসাকে চরিতার্থ করিবার অধিকাব ছিল তখনই, যখন তাহা আর কোথায়ও বিঘ্ন ঘটাইত না। কিন্তু সে যখন আব একটি হৃদয়ের ভালোবাসাকে ব্যঙ্গ করিতেছে, সে যখন নিজের জীবনের সাধনার অপমান করিতে বসিয়াছে, তখন তাহাকে আঁক্ড়াইয়া থাকিবার পথ নাই। প্রেম থাকে থাকুক, তাহাকে কামনার কবল হইতে মুক্তি দিতে হইবে। হুঁ তাই। প্রেমে বিরোধ নাই, বিরোধ শুধু তাহার কামনার চরিতার্থতা লইয়া।

বিনিদ্র রজনীর মায়াকাঠিতে চিন্তার তন্তুগুলি জটিল হইয়া উঠিল, চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

সকাল বেলা এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া যখন শান্তার চোখেমুখে ছড়াইয়া

পড়িল, হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল, ওঃ, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে।

দৈনন্দিন কাজ যথানিয়মে চলিল। ব্যক্তিবিশেষের জন্য জগতের গতি থামে না! কোথাও হাসি, কোথাও কান্না, কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার, মিলিয়া মিশিয়া চিত্রখানি সমানই থাকিয়া যায়। যদি বা কোনও প্রান্তে একখানি কালো রেখা পড়ে, কে তাহার খেয়াল করিবে?

ঘুম :হইতে উঠিয়া মুখ ধোওয়া, ক্যালেণ্ডারে তারিখ বদ্‌লানো, খাওয়া ও খাওয়ানো, মাণিককে পড়াইতে বসা পর্য্যন্ত কোনও একটি কাজ বাদ পড়িল না। দুপুরের আহার সারিয়া অনেকদিন সে ঘুমায়, আজ ঘুমাইল না, প্রিয়লালের পড়ার ঘরে গিয়া গীতা খুলিয়া বসিল।

প্রভা আর সুষমা ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া তাড়া দিলেন, "চল্ চল্, কাপড়-চোপড় পর্ গে' যা।"

সুপ্তোত্থিতের মত অবাক্ হইয়া শান্তা বলিল, "সে আবার কি? যাচ্ছ কোথায়?"

"বাঃ, মিউজিয়ামে!"

ওহোঃ, শান্তা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল সে কথা। অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তাইত। কিন্তু বড্ড রোদ যে! এক্ষুণি যাবে?"

সুষমা বাহিরের দিকে চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "এক্ষুণি না গেলে হবে কেন? মিউজিয়াম্ থেকে আবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবার প্ল্যান্ আছে যে! ওঠ্, শীগ্‌গির কর্।"

শান্তা চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া শ্রান্তিভরে বলিল, "তাহলে তোমরা যাও, আমি নাই গেলাম।"

"কেন?"

"ইচ্ছে কর্চ্ছে না, কাকীমা।"

প্রভা বলিলেন, "অসুখ করেছে নাকি ?"

শান্তা মনে মনে কেমন একটা অপমানের আঘাত পাইল। চট্ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিয়া বলিল, "অসুখ টসুখ কিচ্ছু করেনি গো! আসল কথাটা, মিউজিয়াম্ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবার আমার একবিন্দু সখ নেই, দেখে দেখে পচে গেছে। তার চেয়ে ঘরে বসে আরাম করে ঘুমোব।"

"দেখতে তো পাচ্ছি বই খুলে বসা হয়েছে।"

সুষমা টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া এক ধমকে বলিলেন, "আসল কথা হল তাই! থাক্ থাক্, গীতা উপনিষদে আর কর্ম্ম নেই, ঢের হয়েছে।"

বইখানা ছিনাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই শান্তা একটানে তাহাকে কোলের উপর নামাইয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "ও হচ্ছে না, আমি যাবই না।"

দুই কাকীমা মিলিয়া টানাটানি করিতে ছাড়িলেন না।

অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, ওজুহাত দেখাইয়া শান্তা অব্যাহতি পাইল।

* * * * *

দুই বাড়ী নিস্তব্ধ। দেবতা যাহাদেব আশীর্ব্বাদ করেন, হাসি তাহাদের ফুরায় না; অন্যের কান্না তাহাদের কাণে পশে না। তাহারা নিত্য নব স্ফূর্ত্তির সন্ধানে রত, উপভোগে তৃপ্ত। তাহারা তো যাইবেই। কাকীমারা তাই গিয়াছেন। আনন্দের অধিকার নাই শুধু তাহারই। সেই শুধু একা, পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন।

জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া শান্তা দেখিল, কি অশ্রান্ত উৎসাহ, কি অফুরন্ত জীবন!

বই হাতে করিয়া ফুটপাথের উপর কে ঐ আসিয়া উঠিল! উদ্‌গ্রীব নয়নে মাথা তুলিয়া শান্তারই জানালার পানে তাকাইল কেন? পলকের মধ্যে শান্তা চক্ষু ফিরাইয়া লইল, বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছে। কতদিন পরে ঐ আদরের মুখখানি চোখের সামনে দেখা দিল। সেই স্নেহ ঢল ঢল মাধুরী, শুধু সে সজীব দীপ্তিটুকু হারাইয়া গেছে। বড় ম্লান, বড় পাণ্ডুর। উঃ, তাহার সত্যকামের এ কি শ্রী!

দিগন্তে সায়াহ্নের ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। ধূমধূসর আকাশের শেষ বর্ণ-চিহ্নটুকু গাঢ় হইয়া ঢাকিয়া গেল। যে আলো তখনও ছিল, আর সেটুকুও নাই। আঁখি অন্ধ, পথ বন্ধ।

শান্তা সমস্ত বাড়ীখানির নীরবতা ভাঙিয়া ডাকিল, "নারাযণি!"

ঝি উত্তর করিল, "কেন দিদিমণি?"

"ও-বাড়ীর কাকামণিকে বলে এসো আমি ডাক্‌চি।" সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

সত্যকাম তখন ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া অন্ধকারের মধ্যেও একখানা পত্রিকা কোলের উপর খুলিয়া রাখিয়া বিবর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। মাঝে মাঝে ভাবিতেছিল, একবার বাহিরে কোথাও খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে কি না। এত অন্ধকার, এত নিঃসঙ্গতা আর ভাল লাগে না!

ঝি আসিয়া খবর দিল। সত্যকাম অর্দ্ধশয়ন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? দিদিমণি?"

"হাঁ কাকাবাবু। আর কেউ তো বাড়ী নেই!"

সত্যকাম চমক্ ভাঙিয়া ফেলিয়া ঝিকে বিদায় দিল, "যাও, আমি

যাচ্ছি।" একি সত্য ? সে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল আপনি সাধিয়া ? কেন ? সত্বর পা টলিল ; হৃদপিণ্ড শাসন না মানিয়া বার বার লাফাইয়া ওঠে।

শান্তা জানালার ধারে বাঁধানো উঁচু ধাপটার উপর বসিয়া বসিয়া মাথা নীচু করিয়া ক্রমাগত নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতেছে। এত অবাধ্য মন তাহার কোনদিনই তো ছিল না !

সত্য আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল।

নিজের ঐ কোণঘেঁষা স্থানটি হইতে বিন্দুমাত্র না নড়িয়া শুধু একবার মাথা তুলিয়া শান্তা নীরসকণ্ঠে ডাকিল, "এসো।"

একটু দূরে একখানা মোড়া পড়িয়াছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িয়া সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া শান্তা সহজ স্বরে বলিল, "অনেকদিন আসোনি—সেইজন্যে, এমনিই।"

"ও !"

"কি হয়েছিলো, আসোনি যে ?"

"তুমি তো ডেকে পাঠাও নি !"

হাসিতে চেষ্টা করিয়া শান্তা বলিল, "না ডাক্‌লে বুঝি আস্‌তে নেই ?"

"না।"

শান্তা চুপ করিল।

সত্যকামও কোন কথা কহিল না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিবিড়তর বেদনা ঘিরিয়া আসিয়া ঘরখানিকে অসহ্য করিয়া তুলিল। খানিক পরে বলিল, "যাই তাহলে ?"

শান্তা পাথরের মত বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

এই কয়দিনের পূঞ্জীভূত অভিমান সত্যকামের বুকের মধ্যে পাথর হইয়া

জমিয়া উঠিতেছিল, শান্তার এত কাছাকাছি বসিয়া তাহার কাঠিন্য যেন গলিতে আরম্ভ করিল। শান্তার মৌনতা যেন তাহার মনের মধ্যে সুরের ঝঙ্কার তুলিল। ডাকিল, "শান্তা!"

শান্তা কথা বলিল না।

"কথা বল, শান্তা। নইলে কেন আমায় ডেকে আন্‌লে এমন করে?"

অবসন্নভাবে শান্তা বলিল, "কি বল্‌ব?"

"যা তোমার খুসী। যা তোমার অনুগ্রহ!"

শান্তা জানালার গায়ে মাথাটা হেলাইয়া দিয়া অর্থহীন চোখে সত্যকামের মুখের দিকে চাহিল। উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

অধীর হইয়া সত্যকাম বলিল, "তাহলে আমার কথাটা আমি বলি? অনেক বলেছি,—আবার বলি?"

পুলকে কাঁপিয়া শান্তা উত্তর দিল, "বলো।"

এক লাফে সত্যকাম মোড়াটাসুদ্ধ শান্তার একেবারে পাশে আসিয়া বসিল। মাথাটা নামাইয়া কাণের কাছে আনিতেই শান্তা বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বোলো না সত্যকাম।"

কোনও বাধা না মানিয়া শান্তার কপোলের কাছে মুখ লুকাইয়া সত্য বলিয়া গেল। শান্তা অবশ হইয়া শুনিল, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বুকের মধ্যে ঘন ঘন দোলা উঠিল। হাসিল না, কাঁদিল না, বাধা দিল না।

সত্য বলিল, "এবার তুমি বল শান্তা। ঐ কথাটুকু তুমি আমায় বলো। শুধু একটিবার।"

শান্তা বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখেব দিকে তাকাইয়াই হঠাৎ চেতনা ফিরিয়া পাইল। ঘরখানি অন্ধকারে থম্‌থমে হইয়া আছে; শুধু বাহিরে রাজপথের গ্যাসের বাতিগুলি হইতে একটা যে অস্পষ্ট আলো আসিয়া পড়িতেছিল, তাহারই মধ্যে সত্যকাম দেখিতে পাইল, শান্তা দাঁত

দিয়া ঠোঁট দুখানি চাপিয়া ধরিয়াও তাহার কম্পন কোনোমতে থামাইতে পারিতেছে না।

এমন অধীরতা এই মেয়েটির মধ্যে সে তো কখনও দেখে নাই। এ তাহার হইল কি ?

"ওকি শান্তা, তুমি কাঁদ্‌চ ? আমি কি ব্যথা দিলাম ?"

শান্তা নিঃশব্দে মাথাটা জোরে দোলাইয়া জানাইল, না। টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা তপ্তজল সত্যকামের উরুতে আসিয়া পড়িল।

সৌজন্য ও লোকাচারের সীমারেখা ধুইয়া মুছিয়া গেল। সত্যকাম দুই হাত দিয়া শান্তার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

শান্তা মাথাটা জোর করিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমি পারবো না, মাপ করো।"

সত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "পার্ব্বে, পার্ব্বে, পার্ব্বে। আমি তোমাকে জেনেচি। মুখ ফুটে শুধু একটিবার বলো।"

শান্তা নিজেকে ধিক্কার দিয়া চোখের জল মুছিযা বলিল, "না।"

সত্যকামের অভিমান ফুলিযা ফুলিযা ওঠে। মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, স্ফুরিত অধর দিয়া কম্পিত স্বরে বাহির হইয়া আসিল, "নিষ্ঠুর !"

শান্তার বুকের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একসঙ্গে ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সত্যকামের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করিল,—বাসি, বাসি, তোমায় ভালোবাসি।

শুধু একটিমাত্র কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সত্যকাম—সত্য—"

আনন্দে শিহরিয়া সত্য ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আর একটু—একটু-খানি স্পষ্ট করে বল, লক্ষ্মীটি। ভালোবাসো ?"

শান্তার সর্ব্বাঙ্গে কে কশাঘাত করিল।

৩১

প্রচণ্ড দহনে শান্তার অন্তর বাহির জ্বলিয়া যাইতেছে। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, হিসাব নাই।

এই তাহার নিষ্কাম প্রেম ? এই তাহার ব্রহ্মচর্য্য ? অপরেশের দাবীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিজেকে ব্রহ্মচারিণী বলিয়া সদম্ভে প্রচার করিতে দ্বিধা হইল না ! পরমুহূর্ত্তেই আসিয়া সত্যকামের কামনার কাছে আত্মসমর্পণ ! এমন বিশ্বাসঘাতকতা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সকল জীব-মানবে নিরাসক্ত সমদৃষ্টি তাহার জীবনের ভিত্তি; অথচ অপরেশের সান্নিধ্য তাহাকে বিষাক্ত করে, আর সত্যকামের আলিঙ্গনও অমৃত। অভাগা অপরেশ !—না, না, না, এ হইতেই পারে না।

সত্যকামের কাছে কেন সে ধরা দিল ? তাহার ন্যায়দণ্ডের সূক্ষ্মবিচারে সত্যকামের স্থান যেথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সীমা অতিক্রম করিতে দিল কেন ? এই বোধহয় সেই মোহ যাহা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে, এই সেই প্রবৃত্তির আকর্ষণ যাহা মানুষের পুণ্যপ্রকৃতিকে নীচে টানিয়া নামায়। এ মোহ তাহারও আছে ? এই প্রবৃত্তির আলোড়ন তাহারও মধ্যে এমন প্রবল ? অপমানে, ঘৃণায় শান্তার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। দুঃসহ, জঘন্য। এমন দীনতা সে সহিবে না। তাহার আবাল্য-জীবনের সাধনা ছিল—শক্তি, প্রেম, পবিত্রতা। আজ শক্তি গেল, পবিত্রতা গেল, প্রেম শুধু কামনায় পঙ্কিল হইয়া সিংহাসন গ্রাস করিতে চায় !

শান্তা কঠিন হইয়া পণ করিল, আত্মার হারানো সম্পৎ আবার ফিরাইবে।

সূর্য্য ডোবে-ডোবে। ছিন্ন ছিন্ন মেঘের আড়াল হইতে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত রশ্মিজাল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া আলোর রেখায় ও কিসের ইঙ্গিত? তাই ত! ক্ষণিকের মেঘাবরণে ভয় কি? চিরকালের জ্যোতিষ্মানের জ্যোতি আবার আকাশকে হাসাইবে। অজানা ঐ গাছের মাথায় ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দক্ষিণের বাতাস লাগিয়া সেগুলি যেন শিহরিল। বসন্তের রঙীণ হৃদয়ে প্রেমিকের স্নিগ্ধপরশ! পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান বাজিয়া চলিয়াছে। উন্মনা হৃদয়ের তারে আসিয়া মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দেয়। উঃ, ওকি গান? প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার যেন!

শান্তা করুণ নেত্রে পশ্চিমে চাহিয়া রহিল। অস্তরাগের গোলাপী আভা তাহার শুভ্র মুখখানির উপরে রক্তিম দ্যুতি মাখাইয়া দিল।

সত্যকাম পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল অনেকক্ষণ। শান্তার ধ্যান-স্তব্ধ হৃদয়খানা সুদূরের কোন্ প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে সাড়া পাইল না, সাড়া দিল না।

সত্যকাম মৃদুস্পর্শে হাতখানি তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া শুধাইল, "কি দেখ্‌চ, শান্তা?"

শান্তা ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিল, "ছুঁয়ো না।"

সভয়ে সত্যকাম হাত সরাইয়া লইল, "কি হল?"

মুহূর্ত্তের বিচলিত ভাব কাটিয়া গিয়া শান্তার সম্বিৎ ফিরিল। করুণ চক্ষু দুইটি করুণতর হইয়া আসিল, ঠোঁট দুখানি আরও নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া শক্ত হইয়া উঠিল।

কোনও উত্তর মিলিল না। সত্যকাম বলিল, "ভারি মিষ্টি আজকের সন্ধ্যেটা। না? না এসে পারলাম না।"

ভারি মিষ্ট! অসহ্য মিষ্ট! তাই শান্তার কাছে আজ অসহ্য তিক্ত।

রোরুদ্যমান হৃদয়ের প্রবল আলোড়ন ঠোঁটের কাছে আসিয়া ফাটিয়া বাহির হয়। শান্তা ঘাড়খানি ফিরাইয়া আড়াল করিয়া উত্তর করিল, "তুমি যাও।"

সত্যকাম মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে বারীন আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—"কি করচেন শান্তাদি? সত্যবাবুও যে! অনেকদিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নি।"

অসময়ে বারীন্দ্রের এই অনধিকার-প্রবেশকে সত্যকাম মনে মনে শাপান্ত করিল। নিতান্ত ভদ্রতায় পড়িয়া ফিরিয়া বলিল, "আপনি?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্গত চোখের জল চাপিয়া ধরিয়া মুখে সহজ হাসিটি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়া শান্তা বলিল, "এসো।"

বারীন কেমন একটু অপ্রতিভ হইয়া সসঙ্কোচে বলিল, "আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন, আমি আস্‌চি একটু মাসিমার কাছ থেকে।"

লজ্জায় মরিয়া গিয়া শান্তা উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হঠাৎ আবার এসেই মাসিমার কাছে কেন? বোসো।"

বারীন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া জানালাব কাছের চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িল।

সত্যকাম নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, ভদ্রতার প্রয়োজন অপ্রযোজন মনে পড়িল না। বারীন বসিতেই নির্ব্বিবাদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বারীন একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার অসুখ করেচে বুঝি?"

"না তো?"

"তবে?"

"তবে কি?"

বারীন্দ্র থামিয়া গেল।

শান্তা প্রসঙ্গের গতি ফিরাইয়া বলিল, "জানো বারীন, সেদিন একটা চমৎকার ফিলজফিক্যাল্ ডিস্‌কোর্স পড়ছিলাম। তখন থেকেই ভাবচি তুমি এলে দেখাব।"

"ফিলজফিক্যাল্ ডিস্‌কোর্স ?"

"হুঁ।"

বারীন একটু হাসিয়া বলিল, "কাব্য হলে বেশী ভালো হত। দর্শন আমি কিছু বুঝতে পাবি না, জানেন ?"

"কবে থেকে ?"

"চিরদিন।"

শান্তা মিষ্টি হাসিযা বলিল, "তাই নাকি ? আমি তো জানি তোমার আনাচে কানাচে দর্শন।"

"ও আপনার কাছ থেকে একটু একটু ধার করচি।"

"তুমি প্রায়ই কেন এসো না ভাই ? বেশ একসঙ্গে পড়াশুনো কর্ত্তে পারি ?"

বারীন বলিল, "ঐ যে সেদিন এলাম !"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিযা বারীন সসঙ্কোচে আবার বলে, "আসল কথা কি জানেন ? আসতে আমি বোজই পারি। রোজই আসতে ইচ্ছে করে—আপনার কাছে থাকতে আমার ভাবি ভালো লাগে। শুধু ভয় হয় আপনি না জানি কি ভাবেন।"

"কিছু ভাবি না বারীন।" অত্যন্ত আদরের সঙ্গে এই কথা কয়টা শান্তা না বলিয়া পারিল না। কী যে সরলতা এই যুবকটির—এত সঙ্কোচ, অথচ এমন নিঃসঙ্কোচ।

বারীন হাসি মুখে টেবিলের উপরের 'মহুয়া'খানা টানিয়া লইয়া মাথা নীচু করিয়া উল্‌টাইতে সুরু করিল।

এতক্ষণে শান্তার বুকের জগদ্দল পাথরখানা ধীরে ধীরে অনেকটা যেন হাল্‌কা হইয়া আসিয়াছে। তবু নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িলেই থাকিয়া থাকিয়া আবার ভিতরটা ভারি হইয়া ওঠে। থাক্, থাক্, ওকথা এখন থাক্। জগতে শুধু সত্যকাম আর অপরেশই নাই, বারীনও আছে। যৌবনে শুধু প্রেমের পিপাসাই থাকে না, আধ্যাত্মিক অনুভূতিও পাওয়া যায়। অন্ততঃ এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে প্রণয়বাসনা দিয়া আবিল করিবার সাধ আজ নাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তা বলিল, "বল্‌তে পারো বারীন, মানুষের মন সহজভাবে যা চায়, আত্মার অনুশাসন কেবলই তাকে উল্টে দিতে চায় কেন? বিরোধটা ঠিক কোন্‌খানে?"

বারীন মাথা তুলিয়া অবাক্ হইয়া কতক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই কথাটাই যে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভেবে এসেছিলাম। এ প্রশ্ন যে আমারই!"

"তোমার কেন?"

বারীন বলিল, "মনটাকে যে বশ মানাতে পারি নে, কেবলই সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যা করি, যা ভাবি, যা সাধ হয়, বুঝতেও পারি না তাকে সামলে রাখতে হবে কি না। নাই বা রাখলাম, তাতে দোষ কি? পোষ-না-মানা পাখীর মত আমার মন যদি আকাশে উধাও হয়ে একটু খুসী হয়—হোক্ না। তাকে খাঁচায় পুরতে চেষ্টা নাই বা করলাম! কারু অনিষ্ট তো করচে না। এতে দোষ হবে?"

এমন করিয়া সে প্রশ্ন করিল যেন শান্তার মতামতেই ইহার শেষ মীমাংসা। শান্তা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দিল, "আমি তো জানিনে ভাই। নিজের মনকে যতই শুধাই, জবাব না পেয়ে ফিরে আসি।"

"না, আপনি জানেন।—বলুন না।"

হায়রে কপাল! নিজের মনের অন্ধ আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া যে সারা হইল, সে দিবে অন্যকে নীতির মাপকাঠি! অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ!

শান্তা আপন মনের অশান্ত ঘূর্ণীস্রোতে দিশা হারাইয়া উত্তর দিতে ভুলিল।

বারীন বাহিরে চক্ষু ফিরাইয়া ধীরে বলিল, "সত্যি বলি যদি শান্তাদি, আপনার কাছ থেকে আমি কেমন যে ইন্‌স্পিরেশান্ মনের মধ্যে পাই— বোঝাতে পারি না ঠিক। সেইজন্যেই তো কাছে আস্‌তে এত ভালোবাসি।"

শান্তা একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "পাগল!"

বারীনের মুখে সলজ্জ হাসি দেখা দিল, "না, সত্যি!"

আকাশের স্তব্ধতার মধ্যে বাণী আছে, সন্ধ্যার নিবিড়তার মধ্যে প্রাণের ভাতি আছে, নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে মিলনের ব্যগ্রতা আছে। সবগুলি একত্র মিলিয়া মিশিয়া অগোচরে ধীরে ধীরে জাগ্রত জীবনের ধারা বহাইতে সুরু করিল। চিন্তার শূন্যতার মধ্যে ভাবের যে অপরূপ পূর্ণতা, সেই পূর্ণতার জাগরণ অলক্ষিতে কখন যে ঘরখানিতে স্পন্দনের ছন্দ তুলিয়াছে, দুইজনের কেহই তাহা অনুমান করিতে পারিল না। বারীন চাহিয়া রহিল শুধু শান্তার ম্লান আঁখি-পল্লবের দিকে, শান্তা আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বোধ দুর্দ্দম ঘাতপ্রতিঘাতের ভারে বিব্রত।

মৌন ভাঙিয়া বারীন্দ্র বলিল, "অনেকদিন থেকে একটা কথা বলব বলব ভাবচি, কিন্তু হয়েই উঠচে না। আজ বল্‌ব?"

"কি ভাই?"

বারীন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কী যে তা নিজেই জানি না। কিন্তু কী যেন একটা—"

বারীন ভাবিয়া বলিল, "কি তা বুঝতে পারি না, তবু যেন ভয় হয়

বল্‌তে। ভয় যে শুধু আপনাকেই তাও নয়—নিজের মনকেই ভয় করি।" তাহার স্বভাবশান্ত মুখশ্রী আরও যেন গভীর হইয়া আসিল, উদাস নয়নের দৃষ্টিটুকু আরও অন্তরতর রাজ্যে উধাও হইয়া চলিল।

এই আত্মভোলা আত্মানুসন্ধানকে প্রশ্ন তুলিয়া বাধা দিবার প্রবৃত্তি শান্তার হইল না; নীরবে সে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

বারীন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শ্রীকান্ত পড়েচেন?"

"হুঁ—।"

"তাহলে তার ভাষাতেই বলি! তাহলে হয়তো খানিকটা এক্‌স্‌প্রেস্‌ কর্ত্তে পারব। নইলে আর কোনমতেই বোঝাতে পারচি না আপনাকে আমার কী যে মনে হয়—আমার জীবনের মধ্যে আপনার জীবনের ছাপ কতখানি!"

"আমার?"

"হ্যাঁ। বলি?"

শান্তা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলো।"

বারীন বলিল, "তোমার পরশমাণিক স্পর্শে আমার অন্তর বাহিরের সব লোহা সোণা হইয়া গিয়াছে; কোথাকার কোনও জলহাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই।" স্বর কাঁপিল না, নিশ্বাস দ্রুত তালে বহিল না, 'শ্রীকান্তে'র মুখস্থ পংক্তি কয়টা একবার আবৃত্তি করিল মাত্র। শুধু তাহার প্রাণের স্পন্দন লাগিয়া কথাগুলা যেন জীবন্ত হইয়া শান্তার কাণে পশিল। শুধু বারীনের স্নিগ্ধশ্যাম মুখের প্রতি রেখায় রেখায় যেন অলক্ষ্য রাজ্য হইতে আলোর ঝরণা ঝরিয়া পড়িল। উচ্ছ্বাস নাই, আছে অতলতা। মিলনের ব্যাকুলতা নাই, আছে পরিপূর্ণতার আনন্দ।

শান্তা উপলব্ধি করিতে গিয়া সীমানা পাইল না। এত অগাধ প্রেম বারীনের বুকের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিল কবে? কিসের বিপুল প্রেরণায়

এমন করিয়া উৎসারিত হইয়া উঠিল আজ? সত্যই, বারীনকে সে-ও কী ভালোই বাসে! বারীনের তরে তাহার অন্তরের মণিকোঠায় যে প্রেমের বেদী রচিত হইয়া আছে, সেখানে পদার্পণ করিবার অধিকার আর কাহারো নাই। সে অনেক উর্দ্ধে, অনেক গভীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—নিভৃতে। সেই বারীন আজ এমনই করিয়া নিজেকে উদ্ভাসিত করিল? এমন শঙ্কাহীন, সঙ্কোচহীন, মুক্ত কণ্ঠস্বরে? শান্তা উপলব্ধি করিতেই পারে না। মনের কোণ হঠাৎ গ্লানিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। এ তো ভুল! এ প্রেম, এ পূজা তো তাহার জন্য নয়। তাহার কুৎসিত হৃদয়ের মূর্ত্তি বারীনের চোখের সম্মুখ হইতে সন্তর্পণে আড়াল করিয়া রাখিয়া সে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। মায়াবরণের ছলনায় বারীনের দেবপ্রকৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে যে অন্ধ, দুর্ব্বল, আসক্ত, কামনার কীট, সেকথা বারীন যদি জানিত, তবে দেবতার এ পূজাসম্ভার দানবীর পায়ে আসিয়া লুটিত না। এ নৈবেদ্য তাহার নয়, এ অমৃত তাহার নয়—একথা আজ বারীনকে সে কেমন করিয়া জানাইবে?

ঐ একটিমাত্র লাইনে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া বারীন অসীম তৃপ্তিভরে পুলকিত হইয়া রহিল। আর কথা কহিল না।

শান্তা অজ্ঞাতে হৃদয়ের সমস্ত স্নিগ্ধতা মথিত করিয়া ডাকিল, "বারীন!"

বারীন বিভোর হইয়া রহিল। প্রাণের মধ্যে কোনও পুলক কম্পন জাগিল কি না বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই—ধীর, শান্ত, অচঞ্চল। শান্তা শুধু অনুভব করিল, তাহার সুস্নিগ্ধ আঁখির জ্যোতি আরও প্রভাময় হইয়া উঠিয়া শান্তার নেত্র-তারকা ভেদ করিয়া আরও গভীরে, নেত্রের পরপারে অন্তরলোকের রহস্যসন্ধানে রত। সেইখানে সেই সুদুর্গম মায়ালোকের নিভৃত শিলাতলে সে যেন তাহার মানসী দেবীর কাছে আজ ধরা দিবে।

অকস্মাৎ স্বপ্নলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারীন লুপ্ত-চৈতন্য ফিরিয়া

পাইল। মুহূর্ত্তে সলজ্জ আভা মুখের উপর আসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তেই সে আভা মিলাইয়া গিয়া গাম্ভীর্য্য ছায়া ফেলিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "যাই আমি।"

অবাক্ হইয়া শান্তা বলিল, "কেন রাবীন? এত শীগ্‌গির?"

"আর থাকা ঠিক হবে না আমার।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শ্রীকান্তের ভাষায় আরও একটা কথা না বলে পারলাম না। 'বড়ো প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্নেহস্বর্গ হইতে, মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত।'"

শান্তা রাবীনকে আজ যেন চিনিতে পারিতেছে না। মুখে কথা যোগাইল না।

রাবীন বলিল, "যাই আজ? আর একদিন আসব—যদি পারি। আজ যাই?" পরিমিত পদক্ষেপে, স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়, অটুট্ গভীরতায় সে বাহির হইয়া গেল।

শান্তা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত বেদনা, সমস্ত কামনা, সমস্ত ধিক্কার বুকের উপর প্রবল বিক্ষোভে আছড়াইয়া পড়িল। প্রেম, প্রেম, প্রেম—আর কিছু কি নাই? কর্ত্তব্য আর কর্ত্তব্য—আর কি কিছু নাই? প্রেমকে সুদুর্লভ মনে করে বলিয়াই কি প্রেম প্রত্যাখ্যান করাই তাহার বিধিলিপি? আনন্দ দান করা জীবনের ব্রত বলিয়াই কি, পদে পদে মানুষকে ব্যথা দেওয়াই তাহার নিয়তি? দুর্ব্বলতাকে ঘৃণা করে বলিয়াই কি প্রতি চরণক্ষেপে তাহার স্খলন? বিবেকের বিচার বিনা পা ফেলিবে না গর্ব্ব বলিয়াই কি তাহার সমস্ত পথ আজ রুদ্ধ হইয়া গেছে? একি প্রাণান্তকর প্রহেলিকা!

আকাশের নক্ষত্রগুলা যেন নিভিয়া গেল, মলয় তাহার নিশ্বাস রোধ করিল, চোখের সামনে শুধুই কালো, নিবিড় কালো, অঙ্গে বড় যে জ্বালা। উঃ! সত্যকাম, সত্যকাম—অপরেশ!

বিধাতা, পথ কই? পথ চাই-ই। আমি যাইব।

বারীনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিটি আসিয়া চোখে লাগে।

সমাপ্ত